৩৯ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র বনাম যুবক	সুগত সিংহ	৬
স্মরণ: এ কে রায়	রঞ্জন ঘোষ	১২
গণ-উন্মত্ততা	শঙ্করনারায়ণ দাস	১৯
জরায়ুহীন যন্ত্রের সারি	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৩
জলসঙ্কট	পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	২৬
জল ধরে নিরসন	বরুণ ভট্টাচার্য	২৮
সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণ	দেবীপ্রসাদ রায়	২৯
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৮৯০২৪১২২৯০/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

স্বখাত সলিলে

প্রয়াত প্রাক্তন সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে প্রতি বছরই আমরা এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করি। এবার তা একাদশ বর্ষে। বক্তা পাঠকদের পরিচিত— গৌতম মিস্ত্রি। বিষয়: নাড়ি টেপা ডাক্তারির দিন আর নেই। ১৬ নভেম্বর, মহাবোধি সোসাইটিতে, বিকেল ৪টেয়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

সিঙ্গুরে টাটার কারখানা না হওয়ার শোকটা অনেকেই ভুলতে পারছেন না। দিনকয়েক আগে এক পথসভায় কমরেডরা মুণ্ডুপাত করছিলেন বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের। বার বার সজোর বলছিলেন, কারখানা হলে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রটা কীভাবে বদলে যেত। কমরেড নিশ্চয়ই বুর্জোয়াদের কাগজ পড়েন না। জানেন না, টাটারা গুজরাটের যে সানন্দায় কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে গাড়ি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। এখানেও অন্য কিছু হতো না। কারখানার জায়গায় গগনচুম্বী বহুতল আবাসন হতো প্রবাসীদের জন্য।

পরের পাতায়

১১শ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

১৬ নভেম্বর, বিকেল ৪টে

‘নাড়ি-টেপা ডাক্তারি’-র দিন আজ আর নেই

বক্তা: ডাঃ গৌতম মিস্ত্রি

মহাবোধি সোসাইটি

৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

(কলেজ স্কোয়্যারের পূর্ব দিকে)

যেমন, বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে। এখানেও একসময় হিন্দমোটর হয়েছিল। সত্যিই বদলে গিয়েছিল ওই অঞ্চলের ছবি। শেষমেশ কী হয়েছে সবার জানা। ধরে নেওয়া যাক, সিঙ্গুরে কারখানা হল। এক লাখি গাড়ি ইঁদুরের চেয়েও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করল। বাড়ি বাড়ি গাড়ি হল। তারপর? তার আর পর নেই। এখন শুধু টাটা নয়, গোটা গাড়িশিল্পই ধুঁকছে। কর্মী-সঙ্কোচন শুরু হল বলে। বহু শোরুম বন্ধ। চারিদিকে গেল গেল ভাব। পরিবেশবাদীরা খুশি হতে পারেন। পরিবেশ দূষণে গাড়ির ভূমিকা যে সবচেয়ে বেশি, তার প্রসঙ্গ টানতে পারেন। বর্জ্য গ্যাস, তাপ এবং গাড়িতে ব্যবহৃত বাতানুকূল যন্ত্র— একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। টাইমস অভ ইন্ডিয়ার খবর (১৮ সেপ্টেম্বর)— ব্ল্যাক কার্বন পার্টিক্লস টিপিক্যালি এমিটেড বাই ভেহিক্ল এক্সহস্ট অ্যান্ড কোল-ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্টস হ্যাভ বিন ডিটেক্টেড অন দ্য ফিটাস-ফেসিং সাইড অফ প্ল্যাসেন্টা'। গাড়ি থেকে বেরনো কার্বন মায়ের ফুসফুস হয়ে গর্ভের সন্তানের শরীরেও সেঁদিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব পরিসংখ্যানে কি হবে! বেকার-জর্জর দেশে চাকরিই সবার আগে। তা গাড়িশিল্পই হোক বা চোলাইশিল্প, মেয়েপাচারই হোক বা জালনোট— বন্ধ হলে হাজার হাজার মানুষের বেকারত্বের প্রশ্নটাই সামনে এসে পড়ে। ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকেও দেখা যায়। আমাদের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিকরা কৃষিনির্ভর দেশে যৌথ খামার গড়লেন না, কৃষিনির্ভর শিল্প গড়লেন না, পায়ে পড়লেন গাড়ি ও মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর। প্রশ্ন তুলতে লাগলেন— কৃষকের ছেলে কি কৃষক হবে! মানে কৃষিকাজ অত্যন্ত ছোট কাজ, ছোটলোকেরা করে। তোমরা জমি বেচে বাবু হও, মোটর কারখানায় কাজ করো। গোটা বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে ভাবিত। ছোট গাড়ির বদলে যেখানে গণ পরিবহনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আমরা চাই সস্তায় গাড়ি। যাতে পরিবারে, মায় মাথাপিছু একটা গাড়ি লোকে কিনে ফেলতে পারে। পরিবেশ-টরিবেশ নিয়ে ভেবে লাভ নেই!

এক সময়ে স্কুলে রচনা লিখতে হত— বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। বহুজাতিক সংস্থা ক্ষতিফতি বোঝে না, বোঝে মুনাফা। আমাদের দেশচালকরা তাদের পদাশ্রয়ী। থ্রিজি ফোরজি ফাইভজি— যা খেল দেখাবে দেখবে। জিনবদলানো শস্য ঢুকে পড়ছে। ইউনিয়ন কার্বাইড কত লোককে মেরে ফেলল ভূপালে। আমরা নিরুত্তাপ। খবরও রাখি না, মনসান্টো কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদেশে ১৩ হাজার মামলা চলছে। তারা আগাছা মারতে গ্লাইফোসেট নামে যে রাসায়নিক ব্যবহার করছে, তার সঙ্গে লিম্ফোমা ক্যান্সারের যোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে কোম্পানিকে ২০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে মামলাকারীদের। বিজ্ঞান প্রযুক্তির গুঁতোয় স্বখাত সলিলে ডুবে মরা একেই বলে।

আসি অন্য প্রসঙ্গে। সবাই যে পিঠ পুড়ছে বলে ফিরে শুচ্ছি তা নয়, অনেকেই নিজের মতো করে লড়াই চালাচ্ছেন। তেমনই একজন সাবর্ণ সরস্বতী। তাঁর প্রায় একক প্রচেষ্টায় কচুরিপানা আর আগাছায় রুদ্ধ ইছামতী নদী ১৯ বছর পর আবার গতিময়ী। সাবর্ণ নদীর ধার দিয়ে ১৪০ কিলোমিটার জুড়ে প্রচার চালিয়েছেন। বাধা যেমন পেয়েছেন, পাশে পেয়েছেন বহু সংগঠন ও মানুষকেও। ইতিমধ্যে নদীর ১২ কিলোমিটার পথ পরিষ্কার। এক সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে আগের ও পরের অবস্থার ছবিও ছাপা হয়েছে। এই উদ্যোগ টালিনালা বা অন্য ক্ষেত্রে নিতে পারছি না কে জানে!

জোহানেসবার্গের উইটওয়াটারস্ট্রান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কারেন হফম্যান টাইমসের তরু বাহলের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। বলেছেন— 'ইন্ডিয়া শুড বেওয়্যার অভ বিয়িং কলোনাইজড এগেইন— দিজ টাইম ইন দ্য ফর্ম অভ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ।' প্রভূত লাভদায়ী প্রসেসড ফুড ও পানীয়কে এমন সহজলভ্য করে তুলছে, এমনভাবে বাজার ধরে ফেলছে এবং সাধারণ মানুষের রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে স্বাস্থ্যকর খাবারে ফেরা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই জাঙ্ক ফুডের মূল লক্ষ্য শিশুরা। টিভিতে ও বাইরে বাহারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওরা গ্রাহকদের রুচি-চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করছে। ভারত আবার উপনিবেশ হয়ে উঠছে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর।

উমা

ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পাঠকেরা খেয়াল করুন

পাঠকরা একটু খেয়াল রাখবেন, আমাদের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ-এর নাম Utsomanush। তাই Utsamanush দিয়ে খুঁজবেন না। ওটি আমাদের পুরনো ঠিকানা, বর্তমানে বাতিল।

আমাদের ওয়েবসাইট: utsomanush.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

পর্ব ৯

গণেশপুজো, চন্দ্রযান ও শিশিরকুমার

আশীষ লাহিড়ী

গণেশপুজো বাঙালির উপ-জাতীয় মহাপুজো হয়ে ওঠার পর থেকে ন্যাড়াদার খাতির খুব বেড়ে গেছে। বিশেষত ঠিক কত হাজার বছর আগে কোন নার্সিংহোমে কোন কোন ডাক্তারের হাতে গণেশের প্লাস্টিক সার্জারিটা হয়েছিল, সেসব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যনিষ্ঠ গুল্প ছেড়ে মিন্টুর চায়ের দোকান মাতিয়ে রাখেন তিনি। ফচঁকে ছেলেরা আড়ালে তাঁকে এনসাইক্লোপিডিয়া গাঁজান্তিকা বলে ডাকে। তাঁর নবতম প্রস্তাব, আসছে বছর যখন আবার গণেশপুজো হবে, তখন ওই প্লাস্টিক সার্জারিটাকেই থিম করতে হবে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য ন্যাড়াদা সাদা-নীল-গেরুয়া প্লাস্টিকের চাদরে গণেশ-মণ্ডপ মুড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন। কোনো একটা ছোট্টো কোণে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে একটু লাল সিঁদুরের ছোপও দেওয়া থাকবে। একটাই মুশকিল। প্লাস্টিকের ব্যবহারের ওপর নাকি নিষেধাজ্ঞা আছে। এই নিয়ে ন্যাড়াদা একটু চিন্তায় আছেন। তবে সেদিনের চ্যাংড়া ছোঁড়া নন্তু, যে কিনা সবে ডাক্তারি পাশ করেছে, সে তাঁকে বহু কষ্টে বুঝিয়েছে, 'ও-প্লাস্টিক এ-প্লাস্টিক নয়'। তার পর থেকে ন্যাড়াদা একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছেন।

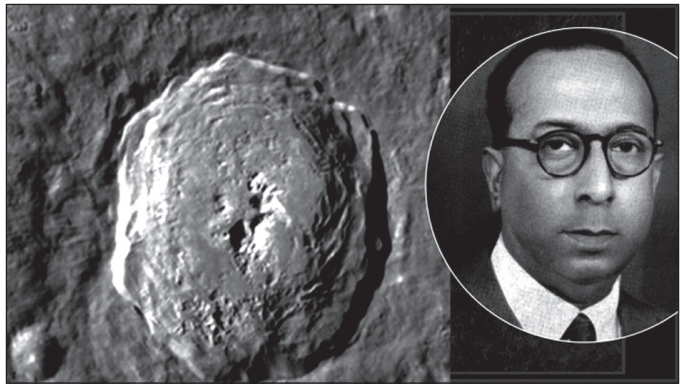

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততায় বাদ সেধেছে চন্দ্রযান। বর্ষার কলকাতার রাস্তার মতো খানাখন্দে ভর্তি চাঁদের পিঠের ছবি তুলেছে চন্দ্রযান, আর বিশেষ একটা খোঁদলের (ক্রেটারের) নাম দিয়েছে 'মিত্র'। কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে। নেটেও তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা। মিন্টুর চায়ের দোকানে পাড়ার লোক দলে দলে ন্যাড়াদার কাছে এসে শুধোচ্ছে, কে এই 'মিত্র'? ন্যাড়াদা দমবার পাত্র নন। প্রথমে বললেন ওটা ভুল ছেপেছে, হবে শ্যামল মিত্র। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র পল্টু বলল, না ন্যাড়াদা, ওটা শ্যামল নয়,

শিশিরকুমার মিত্র। ন্যাড়াদার চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'না রে ছোঁড়া, ওটা মিত্র নয়, ভাদুড়ী। তোরা বাংলা মঞ্চের কতটুকু খবর রাখিস! তোদের এই কৌশিক সেন-ফেন যার কাছে নস্যিও নয়, তাঁর নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সে কি আজকের কথা রে!' বলে গুছিয়ে একখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় যাদবপুরের ঢেঁটিয়া ছাত্র হরেন তার হাতের স্মার্ট গুপিযন্ত্র খুলে পরিষ্কার দেখিয়ে দিল, ওটা ভাদুড়ী নয়, মিত্রই— শিশিরকুমার মিত্র। এবং তিনি একজন মস্ত বিজ্ঞানী। সত্যেন বসু-মেঘনাদ সাহাদের সমসাময়িক।

চন্দ্রযানের তোলা ছবি। নতুন ক্রেটারটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মিত্র'। ডানদিকে শিশিরকুমার মিত্র।

এবার সত্যিই একটু ফ্যাঁসাদে পড়ল ন্যাড়াদা। সত্যেন বোস হলে না হয়, এসরাজ-ফেসরাজ নিয়ে একটা গুল্প ফাঁদতে পারত। মেঘনাদ সাহা হলেও বলতে পারত, উনি তো এমপি ছিলেন, আমার কাছ থেকে টিপ্‌স নিয়ে নেহরুকে সংসদে তুলোধোনা করতেন। কিন্তু এই শিশিরকুমার মিত্র লোকটা কে? বাপের জন্মে তো এঁর নাম শুনিনি।

ন্যাড়াদারই ছোটোবেলার বন্ধু অশোক পতিতুন্ডি, হরিমতী গ্রাম্য হিতকারী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের মাস্টার ছিলেন। কখনও-সখনও মিন্টুর দোকানে আড্ডায় আসেন আর ন্যাড়াদার গুল্প শুনে গোঁফের ফাঁকে মুচকি মুচকি হাসেন। সেদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। দিব্যি ছিলেন খোশমেজাজে, হঠাৎ গেলেন খেপে। অশোকদার ওরকম মাঝে মাঝে হয়। পাড়ার ছেলেরা আড়ালে ওঁকে বিজ্ঞান-খ্যাপা বলে। রেগে গেলে উনি আবার একটু তোতলা হয়ে যান। হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, 'দে-দে-খ ন্যাড়া, অশিক্ষিতের মতো ক-কথা বলিস নি। আর ক-ক-বে নিজেদের ইতিহাস শ্-শ্-শিখবি তোরা?' বলে হঠাৎ আবার শান্ত হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন।—

শিশিরকুমার মিত্র: বাঙালিদের বিজ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ

শিশিরকুমার মিত্রের জন্ম কলকাতায়, ২৪ অক্টোবর ১৮৯০ সালে। বাবা জয়কৃষ্ণ ছিলেন কোন্নগরের এক গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সন্তান। জয়কৃষ্ণ তাঁর বাবার মতের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সালে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মকন্যা শরৎকুমারীকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করে, কোন্নগর ছেড়ে মেদিনীপুরে গিয়ে বাসা বাঁধেন। ১৮৮৯ সালে কলকাতায় এসে ছোট একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বিপিনচন্দ্র পালের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই অতি সামান্য আয়ের সংসারেও তিনি নিজের স্ত্রীকে ডাক্তারি পড়বার জন্য ভর্তি করে দেন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে। সে যুগের বিচারে এ এক অসমসাহসিক পদক্ষেপ।

শিশিরকুমারের যখন জন্ম হয়, তাঁর মা তখনও ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী। ১৮৯২ সালে ডাক্তারি পাস করে শরৎকুমারী ভাগলপুরের লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চাকরি পেলেন। স্ত্রী যাতে সে চাকরি করতে পারেন, সেজন্য জয়কৃষ্ণ নিজে চাকরি ছেড়ে সপরিবার ভাগলপুরে সংসার পাতলেন। সেখানকার পৌর অফিসে কেরানির চাকরি নিলেন।

যথাকালে শিশিরকুমার ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হলেন। তারপরই সংসারে ধাক্কা। একে একে শিশিরকুমারের দুই দাদার ও বাবার মৃত্যু হল। সমস্ত পরিবারের ভার এবার সামলাতে হল একা শরৎকুমারীকে। লেডি ডাফরিন কলেজের ডাক্তারির চাকরি থেকে আয় খুব বেশি হত না। অন্য দুই ছেলের পড়ার খরচ চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ল। তবু সে ভার তিনি বহন করে চললেন। ভাগলপুর থেকে ফার্স্ট আর্টস পাশ করে শিশিরকুমার কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এসসি পড়তে চাইলেন। তার খরচ কম নয়। মা পিছপা হলেন না। শুরু হল শিশিরকুমারের নতুন এক জীবন।

বিজ্ঞানের ছাত্র শিশিরকুমার

শিশুকাল থেকেই শিশিরকুমার অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। ১৮৯০-এর দশকে কলকাতায় রামচন্দ্র চ্যাটার্জি নামে এক তরুণ বেলুনে চেপে ময়দান থেকে বসিরহাটে গিয়ে নামেন। হৈ হৈ পড়ে যায় কলকাতায়। ছড়া বাঁধা হয়:

উঠল বেলুন গড়ের মাঠে
নামল গিয়ে বসিরহাটে।

সব জিনিস আকাশ থাকে মাটিতে নেমে আসে, আর বেলুনটা কিনা ওপরে উঠে ভাসতে ভাসতে চলে গেল! বালক শিশিরকুমার ভেবে ভেবে অস্থির। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, সেই প্রথম তাঁর মনে বিজ্ঞান পড়বার বাসনা জেগেছিল।

শিশিরকুমারের কৈশোর বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার স্বর্ণযুগ। জগদীশচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ— সকলেই তখন স্বমহিমায় বিরাজমান। এঁরাই কিশোর শিশিরকুমারের মনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার তার বেঁধে দিয়েছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, সব লেখা বুঝতে না পারলেও, তাঁর নেশা ধরে গিয়েছিল এইসব বাংলা লেখায়। এগুলি পড়েই তিনি ভবিষ্যতে বিজ্ঞানসাধনা করবার স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

১৯০৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এসসি পড়তে এসে সেইসব স্বপ্নের মানুষদের কাউকে কাউকে চাক্ষুস করলেন তিনি— জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর জীবন যেন পূর্ণ হয়ে উঠল এঁদের স্পর্শ পেয়ে। কী করে এঁরা গবেষণা করেন? গবেষণা মানে কী? কী করে ব্যবহার করতে হয় ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি? সুযোগ পেলেই জগদীশচন্দ্রের ল্যাবরেটরিতে উঁকিঝুঁকি মারেন শিশিরকুমার। জগদীশচন্দ্রের সেই জগদ্বিখ্যাত মাইক্রোওয়েভ উৎপাদনের যন্ত্র দেখে অবাক হয়ে যান। দিন এগোতে

থাকে, প্রথম দেখার বিমুগ্ধ বিস্ময় ক্রমে রূপান্তরিত হয় গভীর উপলব্ধিতে। তিনি স্থির করে ফেললেন, এটাই হবে তাঁর জীবনের কাজ। সংসার চালানোর মতো কিছু উপার্জন করতে পারলেই তিনি খুশি; বাকি সময় ঢেলে দেবেন বিজ্ঞানের কাজে। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এমএ পাস করলেন শিশিরকুমার।

অনিশ্চয়তার পর্ব

এদিকে সংসারের হাল গুরুতর। মায়ের বয়স হয়ে গেছে। এতদিন ধরে একটানা একা হাতে
সংসার টেনেছেন, এবার একটু বিশ্রাম দরকার। ফলে জগদীশচন্দ্রর কাছে গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করতে পারলেন না তরুণ শিশিরকুমার। প্রভাষকের চাকরি নিতে বাধ্য হলেন, প্রথমে ভাগলপুরে, পরে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে। বলা বাহুল্য, কলকাতা থেকে দূরের এইসব কলেজে গবেষণার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। এই সময় বছরচারেক খুব হতাশায় ভুগেছিলেন তিনি। তাহলে কি তাঁর জীবনের সংকল্প বৃথা যাবে? কিন্তু ওরই মধ্যে ছোট্ট ল্যাবরেটরি থেকে যা কিছু রসদ সংগ্রহ করা সম্ভব, তা দিয়েই ক্লাসে পড়াবার সময় নানা ধরনের পরীক্ষা দেখাতেন। তার পর অবশ্য সব দ্বিধা কাটিয়ে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি।

১৯১৬ সালে আশুতোষ যখন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে নতুন শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন করলেন, তখন শিক্ষক হিসেবে সি ভি রামন, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের পাশাপাশি ডেকে নিলেন শিশিরকুমারকেও। রামনের কাছে আলোকরশ্মির নানান ধর্ম নিয়ে গবেষণা করে ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি করে তিনি চলে গেলেন প্যারিসে, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে স্পেকট্রোস্কোপি নিয়ে কাজ করে ডিএসসি করলেন ১৯২৩-এ। কিছুদিন কাজ করলেন মাদাম কুরির ল্যাবে। কিন্তু স্পেকট্রোস্কোপিতে তাঁর কাজ খুবই সমাদৃত হলেও তাঁর মন পড়ে রইল সেই অল্প বয়সে দেখা জগদীশচন্দ্রের রেডিওতরঙ্গ গবেষণার দিকে। ততদিনে ইউরোপে রেডিও ভ্যাল্‌ভ এবং রেডিও-যোগাযোগ নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়েছে জোরকদমে। শিশিরকুমার ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই গবেষণায়। আর তাতেই পেলেন জগৎজোড়া সাফল্য। ভারতে তিনিই আধুনিক রেডিও গবেষণার পথিকৃৎ। পৃথিবীর ওপরে যে-আয়নমণ্ডলের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে রেডিওতরঙ্গ ফিরে আসে পৃথিবীতে, সেই আয়নমণ্ডল নিয়ে তাঁর কাজ সারা পৃথিবীতে নন্দিত হল। কলকাতায় বসে নিজে হাতে বানালেন রেডিও ট্রান্সমিটার, এমনকি অনুষ্ঠান সম্প্রচারও করলেন। ১৯৩৫-এ ইংল্যান্ডের ম্যাক্সওয়েল সোসাইটিতে পাঠ করলেন আয়নমণ্ডল নিয়ে তাঁর পেপার, যা তাঁকে মস্ত খ্যাতি এনে দিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমর্থন নিয়ে, দেশে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি গঠন করলেন রেডিও রিসার্চ বোর্ড। তখন ব্রিটিশ আমল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

ব্রিটিশরা বুঝল, এ গবেষণা যুদ্ধের সময় তাদের কাজে লাগবে। কাজেই তারাও সাহায্যের হাত বাড়াল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হরিণঘাটায় তৈরি হল তাঁর রেডিও রিসার্চ ল্যাব। চব্বিশ ঘণ্টা চলল আয়নমণ্ডল পর্যবেক্ষণ। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত তাঁর বই 'দ্য আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' প্রথমে রুশ, পরে অন্যান্য বহু ভাষায় অনূদিত হল। আয়নমণ্ডল নিয়ে তাঁর অসাধারণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো করে নেয়।

এদিকে স্বাধীনতার পর বিধান রায় তাঁকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব নিতে রাজি করালেন। কোনো কাজেই ফাঁকি দেওয়া তাঁর ধাতে না থাকায় বহু যত্নে পর্ষদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম রচনা করেছিলেন তিনি (পরবর্তী কালে ততোধিক যত্নে সেটার বারোটা বাজিয়েছি আমরা)। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে এবং জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর শরীর ভাঙতে থাকে। বালিগঞ্জে বাড়ি ছিল তাঁর, চাপ কমানোর জন্য লেকের ধারে বানিয়েছিলেন 'চক্রবৈঠক' নামে এক দাবার আড্ডা, যে আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন তিনিই। ১৯৬৩ সালের ১২ অগাস্ট হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়।

#

এতদূর বলে আচমকাই উঠে দাঁড়ালেন অশোকদা। ন্যাড়াদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, পরে যখন মানুষ চাঁদে গিয়ে সোজা মিত্র ক্রেটার-এর সামনে নামবে, তখন নীচে তোদের গণেশপুজোর দিকে একবার তাকিয়ে শুধু বলবে, ছোঃ, এদের কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? চলি।'

উমা

উৎস মানুষ-এ লেখা পাঠান

অভ্র বা যে কোনো ইউনিকোডে কম্পোজ করে উৎস মানুষ-এর ই-মেল ঠিকানায় লেখা পাঠান। একান্ত না পারলে পিডিএফ করেও পাঠাতে পারেন বা হাতে লিখে ডাক-মারফত। লেখা অমনোনীত হলে আমরা জানিয়ে দেব। আমাদের ই-মেল নং utsamanush1980@gmail.com

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র বনাম এক ঊনত্রিশ বছরের যুবক

সুগত সিংহ

আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে কত লোক লাগে তার কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লাখখানেকের উপর লোক এই নেটওয়ার্কে জড়িত। এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন। ফলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ ট্রেনিংপ্রাপ্ত যত লোক তাদের লাগে তত লোক সেদেশে পাওয়া যায় না। পেলেও সবাই গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতে চান না বা সবাইকার উপর এরকম গোপনীয় কাজ ছাড়াও যায় না। তাই মাঝে মধ্যেই হ্যাকারদের থেকে তারা বেশ কিছু আস্থাভাজন লোক নিয়োগ করে। হ্যাকার শব্দের এখন মানে দাঁড়িয়েছে সিঁদেল চোর, যারা ডেটাবেস হ্যাক করে নানারকম তথ্য নিয়ে পালায়। কিন্তু আদতে হ্যাকার গোষ্ঠীগুলির মিশন ছিল বিভিন্ন সফ্টঅয়্যারের কোড ভাঙা যায় কি না তা পরখ করে দেখা। তার ফলে সফ্টঅয়্যারগুলোর সিকিউরিটি লেভেল কতটা পোক্ত তা ধরা পড়ত এবং কোডের নানা রহস্য উন্মোচিত হতো। বিল গেটস, স্টিভ জোবস, স্টিভ উওজনিয়াক, রিচার্ড ম্যাথু স্টলম্যান-এর মতো কম্পিউটার দুনিয়ার অনেক বাঘা বাঘা লোক ছেলেবেলায় বিভিন্ন হ্যাকার কমিউনিটির সদস্য ছিলেন। স্টিভেন লেভি নামে সফ্টঅয়্যার ঐতিহাসিক এই হ্যাকারদের নায়কের সম্মান দিয়েছেন। এঁদের বাদ দিয়ে আজকে যে-কম্পিউটার রিভোলিউশন আমরা দেখছি, তা সম্ভব ছিল না।

ছোটবেলা থেকে কম্পিউটার যেহেতু এদের ধ্যানজ্ঞান, যেহেতু এরা স্বশিক্ষিত, তাই ফর্মাল এডুকেশনপ্রাপ্ত কম্পিউটার প্রফেশনালদের থেকে ডিজিটাল কোড সম্পর্কে এদের অনুভব অনেক গভীর। এরা অনেক সহজে কোনও নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়েন বা একটা নেটওয়ার্ক বিপর্যস্ত করে দিতে পারেন। এডওয়ার্ড স্নোডেনের বাবা ছিলেন ইউনাইটেড স্টেটস কোস্টগার্ড-এর উচ্চপদস্থ অফিসার, মা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের কর্মচারী, দিদি ফেডারেল জুডিশিয়াল কোর্টের উকিল। অর্থাৎ ঐতিহ্যগতভাবে এঁরা একটি দেশভক্ত রাজকর্মচারী পরিবার। স্নোডেনের শিক্ষাদীক্ষা বেশি দূর না এগোলেও ছোটবেলা থেকে তার হবি ছিল ডিজিটাল কোডিং। বন্ধুবান্ধব মহলে তাঁর খ্যাতি ছিল কম্পিউটার উইজার্ড এবং হ্যাকার হিসেবে। মার্কিন সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। সেই বিশ্বাস থেকে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং ২০০৪ সালে ইরাক যুদ্ধে যান সেখানকার মানুষকে একটা দমনমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার ইচ্ছে নিয়ে। কিন্তু ইরাকে গিয়ে তার প্রচণ্ড মোহভঙ্গ হয়। মনে হতে থাকে, আমেরিকানরা সে দেশে গেছে শুধু মানুষ মারতে এবং এভাবে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মনের ক্ষোভ মনে চেপে রেখে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হিসেবে সিআইএ-তে যোগ দেন। তারপর ডেল ইনকর্পোরেটেড-এর তরফ থেকে পেন্টাগনের অন্যতম একটি শাখা এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস 'ন্যাশনাল সিকিওরিটি এজেন্সি'-তে সাইবার স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। এই করতে করতে তিনি ইন্টারনেট এসপিওনেজ-এর এক বিপুল সম্ভার হাতিয়ে নেন। তারপর তিনি এনএসএ-র হাওয়াই রিজিওনাল অপারেশন সেন্টার থেকে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে হংকংয়ে হাওয়া হয়ে যান। কারণ চীনের অন্তর্গত হয়েও হংকংয়ে একটা জোরালো গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য আছে। ২০১৩ সালের জুন মাসে স্নোডেন ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার ও জাঁদরেল অ্যাক্টিভিস্ট লরা পয়ট্রাস এবং মার্কিন সাংবাদিক গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের হাতে চার ল্যাপটপ ভর্তি তাড়া তাড়া ডেটা তুলে দেন এবং রাশিয়ায় পালিয়ে যান। রাশিয়া তাঁকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দেয় এবং সেখানে তিনি রাশিয়ান ভাষা শেখা ও দস্তয়েভস্কি নিয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি যা ডকুমেন্ট দিয়ে গেছিলেন, তার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে দুলাখ।

কারও মতে সতেরো লাখ। তার মধ্যে ইনস্ট্যান্ট মেসেজ এবং ই মেলের সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজার। পয়ট্রাস এবং গ্রিনওয়াল্ডের মধ্যস্থতায় ডকুমেন্টগুলো গার্ডিয়ান ইউএসএ এবং ওয়াশিংটন পোস্টে বেরোতে থাকে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন সরকার যে লুকিয়ে মার্কিন নাগরিকদের উপরে এভাবে নজর রাখছে তাতে সে দেশের মানুষই হতবাক হয়ে যায়। অনেকেই বলতে থাকেন, ওবামার নোবেল শান্তি পুরস্কার কেড়ে নেওয়া উচিত। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে তিনিই বিশ্ব জুড়ে সবচেয়ে গোলমাল পাকিয়ে চলেছেন। তাঁর সরকারের নিক নেম হয় নো-বামা সরকার।

২০০৭ সালে এনএসএ প্রিজম নামে একটি গোপন বৈদ্যুতিন নজরদারি প্রকল্প শুরু করে। এই প্রকল্পে পরে ব্রিটেনের ইন্টালিজেন্স সংস্থা GCHQ বা Government Communications Head Quarter যোগ দেয়। তাদের প্রোজেক্টটির নাম ছিল Tempora। প্রিজম আর টেম্পোরা হয়ে যায় চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। মার্কিন, অমার্কিন, মিত্র দেশ, শত্রু দেশ, রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ মানুষ, টেররিস্ট নির্বিশেষে কোটি কোটি টেলিফোন কল, ফ্যাক্স, মেল, মেসেজ এবং ইন্টারনেট গতিবিধি সংক্রান্ত ডেটা তারা সংগ্রহ করে নেয়। এক এক দিনে তারা কুড়ি মিলিয়ন ফোন কল এবং দশ মিলিয়ন ইন্টারনেট ডেটা ফ্লো হাতিয়ে নিয়েছে। বিশেষত ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল এবং ভারত থেকে প্রচুর তথ্য বেরিয়ে গেছে। যদিও সরকারি ভাবে এই চারটি আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্স আর জার্মানি তো ন্যাটোর মধ্যেই রয়েছে। ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এনএসএ শুধু ভারত থেকে সাড়ে তেরো বিলিয়ন ফোন কল এবং ই-মেল কব্জা করেছে। তার মধ্যে আমার-আপনার কল বা মেলও থাকতে পারে। কারণ কে শত্রু, কে মিত্র, কে জঙ্গি কোনোরকম বাছবিচার না করেই এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এমনকি আমরা যে সেল বা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করি, তাকে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের অজান্তে এনএসএ একটা মাইক্রোফোনে পরিণত করতে পারে। তারপর আপনি যদি বাড়ির নিভৃততম কোণে বসে প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলেন এবং ফোনটি যদি আশেপাশে রাখা থাকে তো সেই কথা আমেরিকায় বসে রেকর্ড হয়ে যাবে। তাছাড়া ফোন তো আপনার লোকেশন বলে দেয়। ক বাবু ও খ বাবু যে তিন চার ফুট দূরত্বের মধ্যে এসেছিলেন, মানে পরস্পর দেখা করেছিলেন, তা দুজনের ফোনের লোকেশন দেখে বলে দেওয়া যায়। আবার সুইচ অফ থাকলেও তারা মাইক্রোফোনটি চালু করে দিতে পারে। একমাত্র বাঁচার রাস্তা হচ্ছে ব্যাটারি বার করে দেওয়া বা ফোনটিকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেওয়া। যখন আমরা নেট দিয়ে কোনও মেল বা কোনও তথ্য দেওয়া-নেওয়া করি তখন সেটা টেলিকমিউনিকেশন লাইন এবং ফাইবার অপটিক কেবল নেটওয়ার্ক দিয়ে গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছোয়।

এই ইন্টারনেট তথ্যপ্রবাহ ৮০ শতাংশ আমেরিকা ঘুরে অন্য দেশে যায়। সমুদ্রের তলা দিয়ে যে ফাইবার লাইনগুলো গেছে এবং মহাদেশগুলোকে সংযুক্ত করেছে এনএসএ তার বিভিন্ন জায়গায় স্প্লিটার লাগিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে দিয়ে যে ডেটা যাচ্ছিল, স্প্লিটারগুলো তা কপি করে নিচ্ছিল। তার এক কপি পৌঁছচ্ছিল গ্রাহকের কাছে, আরেক কপি চলে যাচ্ছিল প্রিজম বা টেমপোরা ডেটা বেসে। ব্রিটিশ টেলিকমিউনিকেশন্স, এটিঅ্যান্ডটি, ভোডাফোন কেবলস, ভেরিজন কমিউনিকেশনস ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে এই মর্মে তাদের গোপন চুক্তি হয়েছিল। কারণ তারাই এই কেবলগুলির মালিক। আরেক কাঠি এগিয়ে এনএসএ মাইক্রোসফ্ট, ইয়াহু, গুগল, ফেসবুক, প্যালটক, স্কাইপ, আমেরিকান অন লাইন ও অ্যাপলের সঙ্গেও বহু টাকার বিনিময়ে গোপন চুক্তি করে ,যাতে তাদের থেকেও ব্যবহারকারীদের (ইউজার) নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অর্থাৎ লুকিয়ে–চুরিয়ে কষ্ট করে আড়ি পাতার বদলে ওইসব সংস্থা থেকে তারা সরাসরি তথ্য পেয়ে যাচ্ছিল।

এই খবর বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সিলিকন ভ্যালিতে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। সিলিকন ভ্যালির নৈতিক শিকড়টি গভীরভাবে হ্যাকার কালচার, আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের লিবারালিজম এবং অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট মননের সঙ্গে জড়িত। তারা এটাকে ইন্টারনেট ফ্রিডমের পিছন থেকে ছুরি মেরে দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখতে থাকে। মাইক্রোসফ্ট, গুগল, ফেসবুক ইত্যাদি সংস্থা কখনও এই অভিযোগ অস্বীকার করতে থাকে, কখনও বা তা-না-না-না করতে থাকে। এরা মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে ব্যবসা করছে এবং চাপ বা প্রলোভনের মুখে পড়লে সেই তথ্য তারা নির্দ্বিধায় এনএসএ, সিআইএ বা এই ধরনের যে কোনও সংস্থাকে দিয়ে দিতে পারে। অপরদিকে টেররিজম আটকানোর নামে নির্বিচারে এই যে বিপুল তথ্য জোগাড় করা হয়েছিল, তাতে লাভের থেকে লোকসান বেশি। হাজারটা তথ্যের ভিড়ে আসল তথ্যটা খুঁজে বার করা জটিল হয়ে যায়। সাধ করে কেউ যদি খড়ের গাদা জোগাড় করে,

তো তার থেকে ছুঁচ খুঁজে বার করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে। ২০০৭ সালে এই ম্যাস ইলেকট্রনিক সারভিলান্স প্রজেক্ট চালু হয়েছিল। তাতেও কিন্তু জঙ্গি হামলা নির্মূল করা যায়নি। আজ অবদি ছোটবড় ঘটনা হয়েই চলেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বা অন্য সূত্র থেকে খবর এসেছে যে টেররিস্ট অ্যাটাক হতে পারে। কমিউনিজমের পতনের পর ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের উপর নজরদারির জমানা শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর তা আবার দ্বিগুণ চেহারায় ফিরে আসে। এতে অন্য একটা লাভও ছিল। যতই বলা হোক সব মানুষের উপর নজর রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভয়টা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় যে দাদারা নজর রাখছেন, তাহলে অনেক মানুষ গুটিয়ে যান। রাশিয়া, পূর্ব জার্মানি, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, চীনের কমিউনিস্ট স্টেট এই ফায়দাটা তুলেছে বা এখনও তোলে। আমেরিকাতেও দেখা যায় স্নোডেনের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর লেখক শিল্পীরা বিতর্কিত বিষয়গুলি মেল এবং ফোনে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এইটুকু করে দিতে পারলেই যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের বিরাট জয়।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ গণনজরদারির বিষয়টাতে অভ্যস্ত হয়ে যান বা আত্মস্থ করে নেন। ভাবতে থাকেন টেররিজ্‌ম আটকানোর জন্য এগুলো জরুরি। আমি তো ছেলেপুলে, সংসার নিয়ে ভালই আছি। আমি তো কোনো গর্হিত কাজ করছি না। সুতরাং আমার উপর নজরদারি থাকলে আর ভয় কি! মনে পড়ে যাচ্ছে রোজা লুক্সেমবার্গের সেই অমোঘ উক্তি, ‘Those who do not move, do not notice their chains’। যে নড়ে বসে না সে বুঝবে কী করে তার গলায় চেন লাগানো আছে। গৃহপালিত সারমেয় চেন ছাড়াই মনিবের পিছু পিছু হাঁটে। এই মানসিকতা ছাড়া চীনের কোটি কোটি মানুষকে এতদিন ধরে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা তো চীনের মতো নয়। সেখানে ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। তাঁরাও নাগরিকদের না জানিয়ে, আইনসভার কোনো অনুমোদন না নিয়ে বেপরোয়াভাবে মানুষের তথ্য চুরি করতে নামেন। স্নোডেনের মনে হয়েছিল, দেশ বলতে আমরা বুঝি তার মানুষ, তাদের আবেগ এবং মূল্যবোধ। সরকার বলতে বোঝায় একটি প্রতিষ্ঠান। এই মার্কিন সরকার আর মার্কিন কনস্টিটিউশন মানছে না। দেশ ও সরকার আলাদা হয়ে গেছে এবং আমেরিকার রাজনীতি এক বিকট দ্বৈত সত্তার প্রকোপে পড়ে গেছে।

ব্রিটিশ সরকারও যে এ ব্যাপারে আর কোনো ন্যায় নীতির তোয়াক্কা করছে না, তা বোঝা গেল গার্ডিয়ান পত্রিকায় যখন স্নোডেনের ফাইলগুলো বেরোতে শুরু করে। তারা বার বার গার্ডিয়ানকে হুমকি দিতে থাকে ফাইলগুলো ফেরত দেওয়ার জন্য। কারণ, তারা ধরতে পারছিল না, কতটা তথ্য স্নোডেন বার করে নিয়ে গেছে। শেষে মরিয়া ব্রিটিশ সরকার চরম হুমকি দিয়ে দেয় গার্ডিয়ানকে দেশদ্রোহিতার দায়ে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। গার্ডিয়ান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২১ সালে। ব্রিটিশ ঐতিহ্যের পরতে পরতে এই পত্রিকার অবদান জড়িয়ে গেছে। ক্ষমতার দম্ভ কোথায় উঠতে পারে, যাতে করে ১৯২ বছরের একটি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া যায়। কিন্তু গার্ডিয়ানের সম্পাদক আলান রাসব্রিজার বেঁকে বসেছিলেন। তিনি জানতেন, স্নোডেনকে যদি কোনোদিন আমেরিকা ধরতে পারে, তো সে কতটা তথ্য নিয়ে গেছে এই হিসেবটা আদালতের সামনে তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য পেশ করার দরকার হতে পারে, যাতে তাকে একটা চূড়ান্ততম শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। অনেক তক্কাতক্কি, ধমক-চমকের পর রাসব্রিজারকে রাজি করানো না গেলেও কিছুটা নতিস্বীকার তাঁকে করতেই হল। আসলে আমেরিকায় সাংবাদিকেরা যে আইনি রক্ষাকবচ পান, ব্রিটেনে তা পান না। কারণ ব্রিটেনে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। সরকার চলে কনভেনশন আর নর্মস মেনে। তার ফাঁকফোকর দিয়ে গুণ্ডামি এবং দাদাগিরির খুব সুবিধে হয়ে যায়। শেষমেশ সাব্যস্ত হয় ওই তথ্য সরকারকে ফেরত দেওয়া হবে না কিন্তু তাদের প্রতিনিধির সামনে নষ্ট করে দেওয়া হবে। ২০১৩ সালের ২০ জুলাই গার্ডিয়ানের লন্ডন অফিসে জিসিএইচকিউ-এর দুজন প্রতিনিধির সামনে অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার, হাতুড়ি, রেঞ্চ দিয়ে হার্ড ড্রাইভগুলো একের পর এক ভেঙে দেওয়া হল। নাৎসি জমানার পর এরকম ঘটনা পশ্চিম ইউরোপে ঘটেনি। গার্ডিয়ানের সাংবাদিকেরা সেই কালো দিনের স্মৃতি হিসেবে হার্ড ড্রাইভের টুকরোগুলো নিজেদের বাড়ি নিয়ে গেছিলেন। আরেকটি টুকরো স্নোডেনকে মেমেন্টো হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙা হার্ড ড্রাইভ কোলে নিয়ে স্নোডেনের ছবি এবং ভিডিও নেটে ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু এটা করে কী লাভ হল? ওই তথ্যগুলোর কপি লরা পয়ট্রাস এবং গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের কাছে থেকেই গিয়েছিল। ডিজিটাল কপি জমানার এটাই সুবিধে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যখন প্যারানয়েড হয়ে ওঠে, তখন এরকম নির্বোধ আচরণ করতে থাকে।

নিরাপত্তার কারণে লরা বার্লিন থেকে এবং গ্রিনওয়াল্ড রিও ডি জেনিরো থেকে একের পর এক তথ্য ফাঁস করে গেছেন। কারণ আমেরিকা আর ব্রিটেনের এই চৌর্যবৃত্তিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি আর ব্রাজিল অন্যতম। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফুর অধিকাংশ ব্যক্তিগত মেসেজ এনএসএ কব্জা করে নেয়। সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ব্রাজিলের সর্ববৃহৎ তেলের কোম্পানি পেট্রোব্রাস কবে কোথায় তেল খোঁড়ার তাল করছে সেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা তথ্য এনএসএ হাতিয়ে নেয়। জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মের্কেল-এর ফোনও দীর্ঘদিন ধরে তারা ট্যাপ করছিল। ইউরোপ জুড়ে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যে এ ধরনের চোরাগোপ্তা আমেরিকান টান বহুদিন ধরে চলছিল। রাষ্ট্রপ্রধানরাও যে ছাড় পাচ্ছেন না এ সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় কোপটা এসে পড়ল ইন্টারনেটের উপর। ব্রাজিল ঘোষণা করে, তারা সমুদ্রের তলা দিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত নতুন কেবল লাইন পাতবে এবং তাদের কোনও তথ্য আমেরিকান নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যাবে না। জার্মানির জাতীয় সংস্থা ডয়েচ টেলিকম একটি ন্যাশনাল ইন্টারনেটের পরিকল্পনা করতে শুরু করে। জার্মানির অভ্যন্তরীণ মেলগুলো আর ইউএস সার্ভারের মধ্য দিয়ে যাবে না।

মার্কিন সার্ভারগুলিই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে। এর ফলে ব্রাজিল এবং জার্মানির মতো প্রতিটি দেশ যদি ন্যাশনাল ইন্টারনেট ব্যবস্থার দিকে হাঁটতে থাকে তো সাইবার সার্বভৌমত্ব (সোভেরিনিটি) নামে নতুন একটি শব্দের অছিলায় ইন্টারনেটের বলকানাইজেশন হবে, হারিয়ে যাবে তার আন্তর্জাতিক ও গণতান্ত্রিক চরিত্র। অনেকে বলতে শুরু করেন, ইন্টারনেট আর Internet থাকবে না, Splinternet হবে। চীন তো অনেক আগেই ইন্টারনেটকে ভেঙে দিয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রও স্প্লিন্টারনেটের কথা ভাবতে শুরু করেছে। সমস্যা হয়েছে অন্যখানে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী যে মসৃণ বাণিজ্যের পথ তৈরি হয়েছে সেটা ভেঙে যাবে। অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্র চাইছে স্প্লিন্টারনেট, আর ক্যাপিটালিস্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চাইছে ইন্টারনেট। সরকারগুলো চাইছে রাষ্ট্রীয় মনোপলি, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো চাইছে আন্তর্জাতিক মনোপলি। এর বাইরে বাকি যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা রয়েছেন, তাঁরা এই দুটোর থেকেই চাইছেন মুক্তি।

স্প্লিন্টারনেট হলে প্রতিটি দেশের ইন্টারনেট বাউন্ডারিতে হাজার গণ্ডা চেকপোস্ট, পাহারা, নিয়মকানুন তৈরি হবে, যেমন চীনে আছে। তা পেরিয়ে গুগ্‌ল, মাইক্রোসফ্‌ট, অ্যামাজন, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও হাজার হাজার কোম্পানির ব্যবসা করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে, যেমন চীনে হচ্ছে। নেট বাউন্ডারি বজায় রাখতে দেশে দেশে সাইবার যুদ্ধ, তথ্যচুরি, পাহারাদারি, অনলাইন মারামারি চলবে। আমার আপনার মতো কেউ ভুলে বাউন্ডারি পেরিয়ে ঢুকে গেলে অনলাইনে গুলি বা ভাইরাস ছুঁড়ে তার কম্পিউটার এবং ফোন নষ্ট করে দেওয়া হবে। পৃথিবী জুড়ে অবাধ তথ্য দেওয়া নেওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তা ধূলিসাৎ হবে এবং ইন্টারনেটের একটা খণ্ডিত, খর্বিত, বিকলাঙ্গ ভগ্নাবশেষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পড়ে থাকবে। সভ্যতার অগ্রগতি কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে। স্নোডেন বোমাটি ফাটার পর ভারতীয় দূতাবাসগুলি নির্দেশ দিয়েছিল সেনসিটিভ তথ্য মেল মারফত না পাঠিয়ে টাইপ করে পাঠাতে। রাশিয়ান দূতাবাসগুলিও কাঁড়ি কাঁড়ি টাইপরাইটারের অর্ডার দিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ঘাতকের গুলিতে নিহত হয়েছেন, এই খবর জাহাজে চেপে আটলান্টিক পেরিয়ে ইউরোপে আসতে সাতদিন লেগেছিল। চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে পৌঁছেছিল তিন মাস বাদে। লিঙ্কনের মৃত্যু হয় ১৮৬৫ সালে আর আটলান্টিকের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফ কেবল পাতার চেষ্টা সফল হয় ১৮৬৬ সালে। সেদিনের পৃথিবীটা কী ছিল, আজকে বসে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সেই সময়ে ফিরে গেলে না আমেরিকা না কোনও দেশের লাভ হবে। তারপর হয়তো চিঠি নিয়ে উড়ে চলা বাজপাখি আর কবুতরদের দিনও দেখতে হবে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে প্রতিটি রাষ্ট্রই আত্মরক্ষার জন্য কম বেশি নজরদারি চালায়। তা বলে ইন্টারনেটকে এই কাজে নামিয়ে দেওয়া হলে গুণগতভাবে আলাদা এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার তুলনা কোনো ইতিহাসেই পাওয়া যাবে না। ইন্টারনেট মানে তো পোস্টাল সিস্টেম, বই, রেডিও, টেলিভিশন বা টেলিফোনের মতো এমন কোনো ব্যবস্থা নয় যেখানে জীবনের আলাদা আলাদা কয়েকটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। ইন্টারঅ্যাক্টিভিটির কারণে তা জীবনের এবং মননের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। অন্তত একটা প্রজন্মের কাছে। এখন পৃথিবীতে দুটোই মাত্র জেনারেশন – BC আর AC। বিফোর ক্রাইস্ট আফটার ক্রাইস্ট নয়। যারা কম্পিউটার আসার আগে জন্মেছে আর যারা পরে জন্মেছে। নেটেই এদের বন্ধুত্ব তৈরি হয়, বই গান সিনেমা বাছাবাছি হয়, মত

বিনিময় হয়, নতুন মত গড়ে ওঠে, পুরোন মতকে যাচাই করা হয়, রাজনৈতিক আদর্শ এবং আন্দোলন গড়ে ওঠে। এখানেই তাদের সোচ্চার এবং নিভৃততম অনুভূতিগুলো ধরা পড়ে। রাষ্ট্র যদি সেখানে ঢুকে পড়ে তো তাদের মনের ঘর বার বলে আর কিছু থাকে না। সবটাই বেআব্রু হয়ে পড়ে। সুতরাং ইন্টারনেট যদি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে তো পরের প্রজন্মটাই নুলো হয়ে যাবে। তারা চূড়ান্ত অস্তিত্ববাদের সঙ্কটে ভুগতে থাকবে। নোঙরহীন মানুষ কী করে বসবে বলা মুশকিল। এই কারণে মাথার উপর নিয়ত মৃত্যুর ভয় সত্ত্বেও এডওয়ার্ড স্নোডেন বা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এত বেপরোয়া। এরা তো এই প্রজন্মেরই মানুষ। স্নোডেন কি দেশদ্রোহী, নাকি হুইসলব্লোয়ার এই বিতর্কে মার্কিন জনগণও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন ওপিনিয়ন পোল-এ দেখা গেছে, নতুন প্রজন্ম স্নোডেনের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে, অপেক্ষাকৃত প্রবীণরা স্নোডেনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন বা বুঝতে পারছেন না বলে কোনো মতামত দেননি। স্নোডেনের উপর নির্মিত লরা পয়ট্রাস-এর তথ্যচিত্র 'সিটিজেনফোর' তথ্যচিত্র বিভাগে সেরা ছবি হিসেবে ২০১৪ সালে অস্কার পেয়েছে। অলিভার স্টোন-এর পরিচালনায় স্নোডেনকে নিয়ে হলিউড ব্লকব্লাস্টার তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ স্নোডেন পপ কালচারের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, আমেরিকান সংস্কৃতি এবং সমাজের মূলে গিয়ে নাড়া দিয়েছেন। আগের প্রজন্মের সমস্যা হচ্ছে কী পাওয়ার কথা ছিল সেটা না বুঝলে কী হারাচ্ছি তা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তারা ইন্টারনেটকে রেডিও, টিভি, টেলিফোন, খবরের কাগজের মতো বা তার থেকে আরেকটু শক্তিশালী একটা মাধ্যম ধরে নিচ্ছেন যা দিয়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপ ইত্যাদি করা যায়। ইন্টারনেটের আসল চরিত্র তাদের কাছে ধরা পড়ছে না। যে জিনিসটা বুঝতে পারছি না, তা নিয়ে প্রতিবাদ, জনমত, সচেতনতার কী দরকার তাই বা বুঝব কী করে!

ইন্টারনেট যে প্রতিটি নাগরিকের নাড়িনক্ষত্র একেবারে উলঙ্গ করে দেবে, তার মন এবং প্রতিটি আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এটা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। এই অজ্ঞতা, এই সারল্য দুনিয়া জুড়ে বিরাট এক সমস্যা। নেট-নজরদারি এড়াতে হ্যাকারদের মূল অস্ত্র হচ্ছে এনক্রিপশন। অর্থাৎ তারা নেটের মাধ্যমে যা কিছু দেওয়া-নেওয়া করে, সেটা একমাত্র যে সেই কোডটা জানে সে-ই খুলতে পারবে। স্নোডেনও এরকম এনক্রিপটেড চ্যাট এবং মেলের সাহায্যে লরা পয়ট্রাস এবং গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। একদিকে হ্যাক্টিভিস্ট* গ্রুপগুলো এবং অন্যদিকে স্পাই সংস্থা বা রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধটা এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে এনক্রিপশনের। কে কত পোক্ত এনক্রিপশন করতে পারে এবং কে সেটা ভাঙতে পারে? অর্থাৎ লড়াইটা আসলে অঙ্কের, অ্যালগারিদমের, কোডের। এটা মধ্য মেধার কারবার নয়, সূক্ষ্ম মেধার কারবার। এ লড়াই বাঁচার লড়াই-এর থেকেও বড় কথা হল এ লড়াই শেখার লড়াই। বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে, তার থেকেও বড় কথা হল বাঁচতে গেলে শিখতে হবে, শিখতে শিখতে বাঁচতে হবে।

অতিরিক্ত রেজিমেন্টেশনে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়, প্রতিদিনের শেখাটা গুলিয়ে যায়। ৭০ বছর, ৩৪ বছর কি চীনের মতো কিছুদিন তাতে লাভ হতে পারে। শেষমেশ সব শূন্যে ফিরে যায়। লড়াইটা আসলে বোধ এবং বুদ্ধির। এবং এটা মরণপণ লড়াই। নইলে স্নোডেন তো তাঁর বিপুল তথ্য রাশিয়া বা চীনের কাছে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামাতে পারতেন। কোথাও না কোথাও অ্যাসাইলামও পেয়ে যেতেন। তা তিনি করেননি। বরং নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তিনি সবটা প্রেসে ফাঁস করেছেন। মৃত্যু তাঁর কানের দোরগোড়া দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ঘটনাচক্রে তিনি রাশিয়ায় গিয়ে উঠেছেন বটে কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে সমস্ত তথ্য সমেত তিনি মরণের অতলে তলিয়ে যেতেন। কেউ সে কথা জানতেও পারত না। স্নোডেন চান না, তাঁর উপর মিডিয়ার নজর থাকুক। তা হলে মূল বিষয়টা চোখের আড়ালে চলে যাবে। তিনি এই নজরদারির যৌক্তিকতা, নৈতিকতা এবং পরিণতি নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক বিতর্ক চেয়েছিলেন। যেটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধে আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ। যারা ডিজিটাল কোডের বিন্দুবিসর্গ জানে না, তারা কী করবে? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে আমরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখব? নাকি ইন্টারনেট ব্যবস্থা থেকে ছিটকে যাব? বলকানাইজেশন রুখতে এবং সাধারণ মানুষের হাতে ইন্টারনেটকে ফিরিয়ে আনতে স্নোডেন এনক্রিপটেড ব্রাউজিং-এর দাবি তুলেছেন। ব্রাউজার এবং সার্চ ইঞ্জিনগুলোর সামনে আমরা শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ি। আমার স্ত্রীও যা জানে না, আমার ব্রাউজার তা জানে। আমি কখন কোন সাইটে ঢুকেছি, কী করেছি, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি সব ইতিহাস সে চিরকালের মতো জমিয়ে রেখে দেয়। ব্রাউজিং হিস্ট্রি থেকে আমার মনের অন্তর্মহলে সে অবাধ যাতায়াত করতে পারে। এনক্রিপটেড

ব্রাউজিং যদি বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয় তো এটা বন্ধ হবে। নচেৎ ইন্টারনেটে যদি কোনো খিড়কি দরজা তৈরি করা হয় তো সেই দরজা দিয়ে যে কোনো লোক বা সংস্থা তথ্য বার করে নিতে পারে। স্নোডেন নিজেই সেটা করে দেখিয়েছেন। স্নোডেনের মতো অল্পবয়সী প্রচুর ছেলেমেয়ে বিভিন্ন দেশের গুপ্তচর সংস্থায় কাজ করে। চপলমতি তরুণেরা যে এসব নিয়ে যা খুশি তাই করে বেড়াবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি সাংবাদিক কখন কোথায় যাচ্ছেন, কাকে ফোন করছেন, মেল করছেন, তার উপর নেট নজরদারি ভয়ঙ্কররকম বেড়ে উঠেছে। এ পথে কারা তাদের খবরগুলো জোগাচ্ছেন সেটাও এক লহমায় জানা হয়ে যায়। ট্রাম্প স্নোডেনকে হাতের মুঠোয় পেতে এখন মরিয়া। পুটিন সে চাপের কাছে নতি স্বীকার করতেও পারেন।

স্নোডেনের তাতে কোনো হেলদোল নেই। জীবনের মায়া তাঁর নেই। তিনি তাঁর আদর্শে অবিচল। তিনি যা বুঝেছেন, তা উঁচু গলায় বলে চলেছেন। সানফ্রানসিস্কোতে অবস্থিত ফ্রিডম অভ দ্য প্রেস নামক একটি নন প্রফিট সংস্থা সাংবাদিকেরা যাতে নেট নজরদারি এড়িয়ে অবাধে কাজ করতে পারেন তার জন্য জরুরি এনক্রিপশনের কাজ শুরু করেছে। মস্কো থেকে অন লাইনে স্নোডেন সেই প্রোজেক্টের তত্ত্বাবধানে আছেন। প্রচলিত সংবাদপত্র এবং চ্যানেলগুলোর এ ধরনের কাজে দক্ষতা নেই, বাজেটও নেই। মিডিয়া স্নোডেনের লড়াইকে মানুষের সামনে নিয়ে গেছে। আর বিভিন্ন পত্রিকা এবং চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়ে স্নোডেন যা রোজগার করেছেন, তার থেকে ৬০ হাজার ডলার তিনি সংস্থাটিকে দান করেছেন। এই প্রোজেক্টে স্নোডেনের দায়বদ্ধতার একটাই কারণে। আমেরিকা যদি একটা দেশের তথ্য বার করে নেয় তো সে দেশও আমেরিকার তথ্য বার করে নিতে পারে। রাশিয়া তা করেছেও। রাশিয়ায় বসে সে দেশের নেট সারভিলান্স প্রোজেক্টগুলিকেও স্নোডেন সমালোচনা করতে ছাড়েননি। কারণ এভাবে প্রতিটি দেশ যদি প্রতিটি দেশের তথ্য বার করে নিতে থাকে, অধিকাংশ মানুষ যদি অধিকাংশ মানুষের তথ্য চুরি করে নিতে থাকে তো দুনিয়ার স্থিতাবস্থা নড়ে যাবে। মানুষের সমাজ যেরকম কতগুলো রীতিনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, ইন্টারনেটও তাই। ঠিক যে কারণে একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে দেখলেই আক্রমণ করে না, সেই কারণেই ইন্টারনেট প্রোটোকল মেনে না চললে দুনিয়াটাই টিকবে না। খিড়কি দরজা দিয়ে উঁকি মেরে নেট সিকিউরিটি কখনই বাড়বে না। উল্টে তার দফারফা হবে। মানুষের তথ্য নিয়ে মানুষকে লুকিয়ে কিছু করা যাবে না। তথ্যের অধিকারকে মান্যতা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। নইলে আমরা একটা স্থিতিশীল ইন্টারনেট এবং স্থিতিশীল বিশ্বে পৌঁছতে পারব না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, ইন্টারনেটের স্থিতিশীলতা ছাড়া আর বিশ্বের স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

১) Hackers the Heroes of Computer Revolution— Steven Levy. O Rilley. Sebastopol. 2010.

* হ্যাকাররা অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে উঠলে তাঁদের Hactivist বলা হয়। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে সুগত সিংহের ‘তথ্যের অধিকার মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন’ বইটিতে। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স।

উমা

হায় রে কেন?

অমিত চৌধুরী

দুর্গা মানেই উৎসব, আর
মেলামেশার দেশ!
হায় রে কেন,
এমন সময়
ধর্মীয় বিদ্বেষ?

দুর্গা আসেন সরিয়ে মেঘ
আকাশ জুড়ে আলো।
এবার এসে
করবেন কি!
দূষণে সব কালো।

দুর্গা এলেই শারদ–সংখ্যা
থাকতো হাতে হাতে!
হায়রে সবাই—
বই ফেলে আজ
ইউটিউবে মাতে।

স্মরণ এ কে রায়

ইউনিয়ন পরে হবে আগে লড়াই

রঞ্জন ঘোষ

ধানবাদ কয়লা অঞ্চলের প্রবাদপ্রতিম শ্রমিক নেতা এ কে রায় অনেক দিন রোগভোগের পর গত ২১ জুলাই প্রয়াত হলেন। শেষের দিকে বছরপাঁচেক ওঁর শরীরের একটা দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একটা হাত নাড়াতে পারতেন না, কথাও বলতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর পরিচিত হাসিটি অমলিন ছিল। কেউ দেখা করতে এলে তাঁর হাতটা নিজের ভাল হাতটা দিয়ে চেপে ধরতেন, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর হাতের চাপ আর বোবা হাসি বুঝিয়ে দিত উনি আগন্তুককে চিনতে পেরেছেন। কত লোক যে দেখা করতে আসত! কোলিয়ারির কুলি-কামিন, গাঁয়ের চাষাভুষো, পার্টির কর্মকর্তা, শ্রমিকনেতা। আমাদের অবাক লাগত, এত লোককে উনি মনে রাখতেন কি ভাবে! শুধু নাম নয়, পরিচিত লোকেদের বাড়ির ঠিকানাও মনে রাখতেন। যতদিন কথা বলার শক্তি ছিল, ধানবাদ জেলার প্রত্যন্ত কোনো গ্রাম বা কুলিবস্তির নাম শুনলেই উনি বলে দিতেন, কেমন করে সেখানে পৌঁছতে হবে, পথে কোথায় নর্দমা পাওয়া যাবে, কোথায় একটা হরিমন্দির। পারতেন, কেননা ওই সব গ্রাম অথবা কুলিবস্তি উনি নিজে ঘুরেছেন সাইকেলে, মোটরসাইকেলে বা পায়ে হেঁটে।

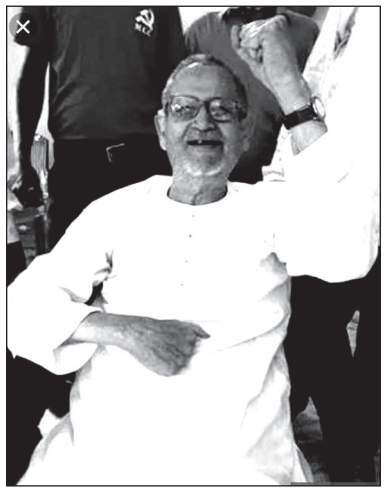

ওই সব নিতান্ত সাধারণ কুলিমজুর আর চাষাভুষোরা তাঁকে আপন করে নিয়েছিল বোধহয় এইজন্যই যে, উনি নিজেও অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন। নিজের হাতে কাচা একজোড়া সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর একজোড়া হাওয়াই চপ্পল ছাড়া অন্য কোনো পোশাকে কেউ কখনও তাঁকে দেখেছে বলে আমার জানা নেই। শীতকালে গায়ে থাকত দানে পাওয়া একটা কোট আর মাথায় মাঙ্কি টুপি। তিনবার বিধায়ক এবং তিনবার সাংসদ হওয়া এই লোকটাকে বিধানসভা কিংবা লোকসভাতেও কেউ কখনও অন্য পোশাকে দেখে নি। তাঁর টালি দেওয়া অফিসঘরে পাখা ছিল না, একটা ৬০ পাওয়ারের বাল্ব, একটা তালপাতার পাখা, দুটো কাঠের বেঞ্চি, কয়েকটা ফাইল ভরা র‍্যাক— এই ছিল আসবাব। গলির ভেতর পচা নর্দমার পাশে মাটির দেওয়াল ঘেরা শয়নকক্ষে বিদ্যুতের প্রবেশ ছিল নিষেধ। মেঝেতে বিছনো পুরোনো প্যাকিং বাক্স আর তার ওপর পাতা মান্ধাতার আমলের এক কম্বল— এই ছিল তাঁর শয্যা। সঙ্গে থাকত একটা হ্যারিকেন। ঐ অফিসঘরে কিংবা শোবার ঘরে হ্যারিকেনের আলোতেই উনি লিখেছেন প্রায় শ'খানেক প্রবন্ধ আর পুস্তিকা— বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজিতে; যা ছাপা হয় আনন্দবাজার, যুগান্তর, বর্তমান, স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, টাইমস অভ ইন্ডিয়া, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ফ্রন্টিয়ার, নব ভারত টাইমস ইত্যাদি পত্রপত্রিকায়। আর ছিল মজদুরদের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বহু সমস্যা সম্পর্কিত হাজার হাজার আবেদন-নিবেদন। এগুলো অধিকাংশই হাতে লেখা— সে অফিসারদের উদ্দেশেই হোক আর পত্রিকার সম্পাদকদের। সর্বোপরি ছিল সংসদের জন্য প্রশ্নমালার খসড়া। তাঁর সময়ে সংসদে সর্বাধিক প্রশ্ন করার রেকর্ড ছিল তাঁরই দখলে। সম্ভবত এ রেকর্ড এখনও ভাঙে নি।

আর একটা বিষয়ে তাঁর রেকর্ড ছিল, সাংসদদের পেনশন প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে এ কে রায়ই সম্ভবত একমাত্র এমপি যিনি কখনও পেনশন নেন নি। পেনশন সংক্রান্ত বিল লোকসভায় পেশ হলে তৎকালীন ৫১২ সাংসদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওই বিলের বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, সমস্ত মানুষ কারখানার মজদুর আর খেতখামারে কাজ-করা কৃষকদের জন্য যতদিন না পেনশনের বন্দোবস্ত হচ্ছে, ততদিন জনতার প্রতিনিধিদের পেনশন নেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার নেই।

এই নৈতিকতা, যা আজকের দিনে একটা ঠাট্টা, এ কে রায়ের

জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। এই নৈতিকতাই বোধহয় তাঁর সাদামাঠা অনাড়ম্বর জীবনের উৎস ছিল। কিন্তু এ নিয়ে বড়াই করতে কেউ তাঁকে দেখে নি। আমরা অনেকেই তাঁর এই জীবনযাত্রাকে বাড়াবাড়ি মনে করতাম। বিরোধীরা বলত ভণ্ডামি। উনি খালি হাসতেন, প্রতিবাদ করতেন না। আবার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়তেন না।

এই অনড়তাই ছিল তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। এটাই তাঁকে সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের থেকে আলাদা করেছিল। এটা ছাড়া মাফিয়া-অধ্যুষিত কয়লা অঞ্চলে ভীত সন্ত্রস্ত কুলি-কামিনদের অথবা গ্রামের আদিবাসী দলিতদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না। এ কে রায়, জ্যোতি বসু কিংবা লালুপ্রসাদের মতো ওজস্বী অথবা মনোরঞ্জক বক্তৃতা দিতে পারতেন না। তবুও তাঁর বাংলা মেশানো হিন্দি ভাষণ শোনবার জন্য হাজার হাজার লোক দূরদূরান্ত থেকে এসে জুটত। আমার মনে হয়, লোকে কেবল তাঁকে দেখতেই আসত। কেন না তিনি ছিলেন কিংবদন্তী। লড়াইয়ের ময়দানে এই সাদামাঠা লোকটার অন্য চেহারা ফুটে উঠত।

সেখানে তিনি থাকতেন সবার আগে। আর এ লড়াই প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের হরতাল, ধর্না, অনশন ছিল না। আবার মাওবাদীদের গেরিলা যুদ্ধও নয়। এ ছিল মুখোমুখি সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ। একদিকে লাঠি, তরোয়াল, বন্দুক হাতে সাত ফুট লম্বা রাজপুত পালোয়ানদের দঙ্গল, অন্যদিকে ইটপাথর হাতে কোলিয়ারি মজদুর, সঙ্গে তীরধনুক হাতে নেংটি পরা সাঁওতাল, কুর্মি, বাউরি। একদিকে রণহুঙ্কার 'বোলো বোলো বজরংবলী কি জয়', অন্যদিকে 'লাল ঝান্ডা কি জয়'। এইসব লড়াইয়ে রায়সাহেব নিজে মার খেয়েছেন, চোখের সামনে কমরেডদের মারা যেতে দেখেছেন, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিতে তাঁকে কেউ কখনও দেখে নি। ইটপাথর হাতে সঙ্গীদের আহ্বান জানিয়ে উন্মত্তের মতো তিনি ছুটে যেতেন শত্রুদলের দিকে। এ যেন সেই 'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' তাঁর সেই অদম্য সাহস আর দৃঢ়তা সঞ্চারিত হত সঙ্গী কুলি-কামিন আর চাষাভুষোদের মধ্যে। তারা ঘুরে দাঁড়াত, মার খেত, গুলি খেত, কিন্তু পালাত না। মধুবন কোলিয়ারিতে এই রকমই এক লড়াইয়ের বিবরণ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট নেতা মুকুটধারী সিং তাঁর 'ভুলি বিসরি কড়িয়াঁ' গ্রন্থে। এই সব লড়াই জন্ম দিয়েছিল কিংবদন্তীর। লোকে বলত 'এ কে রায় বিষ্ণু কা অবতার হ্যায়। দুশমন কা গোলি উনকো ছু নহিঁ সকতা।'

ধানবাদ কয়লা অঞ্চলে এই রকম আরেক কিংবদন্তীর নায়ক ছিলেন আরএসপি নেতা সাধন গুপ্ত। ১৯৪৬-৪৭ থেকে ৫২-৫৩, তাঁর নেতৃত্বে চলা মজদুর আন্দোলন ছিল এমনই উত্তাল, এমনই রক্তক্ষয়ী, ১৯৪৭ সালের ১৭ জুন সাধনবাবুর মূলসাহী মুরলীন্ডিই কোলিয়ারিতে হরতালি কুলি-কামিনদের ওপর চলে পুলিশের গুলি— ১০৬ রাউন্ড। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন পাঁচজন, সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত ২৩ জনের মধ্যে তিনজন মারা যান হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে পাঁচজন কামিন বুলেট খেয়েছিলেন। পরের মাসেই জুলাইয়ের ২৪ তারিখে লয়াবাদ কোলিয়ারিতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ১৪ জন শ্রমিক। আহত সাধনবাবুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ১৯৫৪ সাল নাগাদ ধর্মাবান্ধ কোলিয়ারিতে আন্দোলন চলাকালীন এক ম্যানেজার নিহত হয়। তিনজন শ্রমিকের ফাঁসি হয়, সাধনবাবুর হয় ১২ বছরের কারাদণ্ড। জেলের ভেতরেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। বন্দীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে হামেশাই চালাতেন ধর্না, অনশন। তাই সাধারণ বন্দীদের ছুটিছাটা বাবদ রেমিশন দেওয়া হত, তা থেকে তিনি বঞ্চিত হন। পুরো ১২ বছর তাঁকে কাটাতে হয় জেলে। এ তথ্য আমি পেয়েছিলাম তৎকালীন সরকার পক্ষের উকিল ভোলাবাবুর (ভোলানাথ মুখার্জি) কাছ থেকে। কথিত আছে, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বৃদ্ধ, অসুস্থ সাধনবাবু মজদুরদের এক সভায় এ কে রায়কে ডেকে সবার সামনে তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান— সংগ্রামের উত্তরাধিকার।

এই উত্তরাধিকারী তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন ১৯৬৭ সালে সাধনবাবু মারা যাওয়ার মাসছয়েক আগে। এসেছিলেন সিন্ধ্রি কারখানার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো চাকরি আর ঘরসংসার করা বোধহয় তাঁর ধাতে ছিল না। তাই চাকরির অবসরে চলে যেতেন আশেপাশের গাঁয়ে, চালাতেন নাইট স্কুল। ইতিমধ্যে কারখানার ক্যাজুয়াল এবং ঠিকা মজদুরদের আন্দোলন শুরু হয়। ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ফলত চাকরিটি খোয়ান। কয়েক মাস পরেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সিন্ধ্রি থেকে সিপিআই (এম) প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান। তাঁর বিপক্ষে ছিল জগৎবল্লভ সিং, কুখ্যাত সেই ঠিকাদার, যার বিরুদ্ধেই সিন্ধ্রি কারখানার মজদুররা চালিয়েছিল আন্দোলন। জগৎবল্লভের ছিল টাকা, ছিল পালোয়ানদের দঙ্গল, আর ছিল সরকারি বাবুদের প্রত্যক্ষ সমর্থন। এ সব সত্ত্বেও সবাইকে অবাক করে এ কে রায় জয়ী হলেন। 'আমরা নিজেরাও ভাবিনি যে আমরা জিতব।'

কথাচ্ছলে আমাদের বলেছিলেন রায়বাবু। আশেপাশের কোলিয়ারি, সিন্ধ্রি কারখানার শ্রমিকেরা এবং গাঁয়ের মানুষ মালিক–ঠিকাদার, তাদের পোষা গুণ্ডা আর পুলিশের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো একজন কাউকে চাইছিল। এ কে রায়ের মধ্যে তারা বোধহয় তাদের কাঙ্ক্ষিত লোকটিকে খুঁজে পেয়েছিল। এ জিত এ কে রায়ের জিত নয়, নিপীড়িত মানুষের জিত। তা না হলে নির্বাচনের কয়েকমাস পরেই নিকটবর্তী সাউথ গোলকন্ডিহ কোলিয়ারির পশ্চিমা মজদুররা তাঁর কাছে ছুটে আসবে কেন! ১৯৮৩ সালে বিহার কোলিয়ারি ইউনিয়নের বাৎসরিক সম্মেলনে রায়সাহেব এক বক্তৃতা দেন 'লড়াই এবং সংগঠন কি সুরুয়াত'। সেই ভাষণে সংগঠনের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সিন্ধ্রির সংলগ্ন বলিয়াপুর ব্লকের এক গ্রামে কৃষকদের এক সভা হচ্ছিল। সেই সভায় সাউথ কোলকডিহ থেকে অনেক মজদুর এসে তাদের দুঃখ–দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করে— আন্ডারপেমেন্ট, ঠিকাদারি গুণ্ডাদের আতঙ্ক। এখানে আন্ডারপেমেন্ট শব্দটার মানে কী বলা দরকার। স্বাধীনতার পরে কোলিয়ারি শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির সুপারিশ করে একটার পর একটা কমিটি। মালিকেরা প্রথমদিকে নানা ওজর–আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত এই সুপারিশ মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু এটা স্বভাবতই তাদের পছন্দ ছিল না। তারা ঠিকাদার নিয়োগ করতে শুরু করল। আগে ইংরেজ মালিকানাধীন বড় বড় কোলিয়ারি মালিকেরাই ঠিকাতে কয়লা উৎপাদন করত, ৬০–এর মাঝামাঝি ছোট বড় মাঝারি সব কোলিয়ারি মালিকই ঠিকাদার নিয়োগ করতে শুরু করল, কেন না সরকারি ন্যূনতম বেতনের নিয়ম ঠিকাদারের ওপর লপ্ত করা সহজ কাজ ছিল না। যাই হোক মজদুররা সরকার নির্ধারিত বেতনের চেয়ে অনেক কম বেতন পেতে লাগল। এটাকেই ধানবাদের লোক আন্ডারপেমেন্ট বলত। এই নতুন ঠিকাদাররা বিহারের ছাপরা, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া আজময়ার প্রভৃতি জেলা থেকে আসত রাজপুত, ভূমিহার এবং ব্রাহ্মণ— লম্বাচওড়া চেহারা, তাগড়াই গোঁফ, হাতে লম্বা লাঠি। এরা মজদুরদের কেবল কম বেতন দিত তাই নয়, শারীরিক অত্যাচারও করত। সমসাময়িক অনেক পুলিশ রিপোর্ট এবং সংবাদপত্রে এই নির্যাতনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা একটা আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করেছিল কোলিয়ারি অঞ্চলে। এদের ভয়ে কেউ মুখ খুলত না। দাবিদাওয়া নিয়ে হরতাল করা তো দূরের কথা, কোলিয়ারিতে শ্রমিকেরা কোনো মিটিং করতে গেলেই এরা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসত। কালক্রমে এরা আইএনটিইউসি অথবা এইচএনএস–এর মতো ইউনিয়নের লিডারও হয়ে যায়। বি পি সিনহা, ভাগবত ত্রিপাঠী, রাজদেও রাই, সতদেও সিং, সুরজদেও সিং— আইএনটিইউসি, এইচএনএসএও এই সব নেতারা ছিল একাধারে ঠিকাদার, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার এবং গুণ্ডা।

বলিয়াপুরের কোলিয়ারি শ্রমিক এবং গাঁয়ের মানুষেরা একটা কমিটি গঠন করল 'জনবাদী সংগ্রাম কমিটি' এবং সাউথ গোলকডিই কোলিয়ারিতে একটা মিটিংয়ের দিন ধার্য করল। প্রত্যাশিতভাবেই ঠিকাদার এবং গুণ্ডারা লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এল। কিন্তু তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, মজদুররা পালিয়ে না গিয়ে রুখে দাঁড়াল। তাদের সামনের সারিতে ছোটখাটো চেহারার একটা লোক তাদের উদ্বুদ্ধ করছে। মজদুরদের ইটপাথরের সঙ্গে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর— শ্রমিকদের সমর্থনে আসা গ্রামের সাঁওতাল আর কুর্মিদের তরফ থেকে। গুণ্ডারা পিছু হটল, কোলিয়ারিতে উড়ল লাল ঝাণ্ডা।

এর পর মাঠে নামল পুলিশ। বেধড়ক ধরপাকড় আর নানা ধারায় মোকদ্দমা। মলিকও দিল কোলিয়ারি বন্ধ করে প্রায় ছ'মাসের জন্য। কিন্তু মজদুরদের ভয় আর আতঙ্কের দেওয়াল তখন ভেঙে গেছে, তারা ছড়িয়ে পড়ল আশপাশের খালগুলোতে। দেখতে দেখতে জেগে উঠল কাজি বলিয়ারি, সরল পড়িয়া, লখাবাদ ইত্যাদির কুলি–কামিনরা। উঠে এল কালু পালি, ভজ্জু পাশির মতো নতুন নেতারা। একটার পর একটা কোলিয়ারিতে উড়তে লাগল লাল ঝাণ্ডা। প্যাটার্ন সব জায়গাতেই এক রকম। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মজদুরদের মিটিং, তার উপরে গুণ্ডাদের হামলা, মজদুরদের পাল্টা আক্রমণ। বলা বাহুল্য, অসম এই লড়াইয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মজদুরদের পক্ষেই বেশি ছিল। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮০, পঞ্চাশেরও বেশি শ্রমিক শহিদ হয়েছেন। লাঠি, বর্শা আর গুলিতে পঙ্গু হয়েছিলেন আরও অনেকে, আর জেল খেটেছেন হাজার হাজার লোক। বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও এ কে রায় নিজেও রেহাই পান নি। কিন্তু এই লড়াইয়ে জিত ছিল মজদুরদেরই। তারা যা পেল, তা বেতন বোনাস ইত্যাদির থেকে অনেক বেশি মূল্যবান— আত্মসম্মান, প্রতিষ্ঠা, ইজ্জত। এরপর মালিকদের কাছ থেকে, শ্রম দপ্তর থেকে ডাক আসতে লাগল আলোচনা, মধ্যস্থতার জন্য। এইবার দরকার হল একটা প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নের। তৈরি হল বিহার কোলিয়ারি কামগর ইউনিয়ন। সংগ্রাম শুরু হওয়ার চার বছর পর ১৯৯১-এ। রায়সাহেবের ভাষায়, 'পহেলে লড়াই, উসকে বাদ সংগঠন'। ধানবাদের ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসে এরকমটা আগে হয় নি। সেই ১৯২০ সাল থেকে শিবকালী বসু, সত্যবিমল সেন, মুকুটবিহারী সিং, আব্দুল, সচিন গুপ্ত প্রভৃতি নেতারা আগে ইউনিয়ন গড়েছেন, মালিকদের কাছে, সরকারের কাছে লিখিত

দাবিদাওয়া পেশ করেছেন। রয়্যাল কমিশন অভ লেবার, বিহার লেবার এনকোয়ারি কমিটি ইত্যাদির কাছে শ্রমিকদের তরফ থেকে প্রতিবেদন পেশ করেছেন। তারপর সময়ে সময়ে হরতালের ডাক দিয়েছেন এবং হরতাল করেওছেন। কিন্তু এই ব্যতিক্রমী লোকটি কোনো প্রথাগত, গতানুগতিক পদ্ধতির ধার ধারেন নি। যা ভালো মনে করেছেন, বলেছেন, করেছেন কারও তোয়াক্কা না করে।

এমনকি যে সিপিআইএম পার্টির তরফ থেকে তিনি এমএলএ হয়েছিলেন, তারও পরোয়া করেন নি। ১৯৭২-এ জেলের ভেতর বসে তিনি ভোট অ্যান্ড রিভোলিউশন নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন, যা ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় ছাপা হয়। এটাতে তিনি নকশালপন্থীদের ভোট-বয়কট নীতির প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেন, নিজে ভোটে জেতা সত্ত্বেও। সিপিএমের কর্তারা এই একগুঁয়ে লোকটিকে কখনই সুনজরে দেখেন নি। তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক— সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর।' পার্টি লাইনের বিরোধিতা করার অভিযোগে তিনি নির্বাসিত হলেন।

পরের ভোটে রায়বাবু সেই সিন্ধ্রি থেকেই আবার নির্বাচিত হলেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। এবার তাঁর চিহ্ন কাস্তে হাতুড়ি তারার বদলে তীরধনুক। ইতিমধ্যে ১৯৭১-এ কোকিংকোল খনিগুলো সরকারীকরণ হল। তারপর ১৯৭১-এ কোকিং কোল মাইনস। পুরনো কোলিয়ারির মালিক আর অফিসাররা কারচুপি করে হাজার হাজার পুরনো শ্রমিকের নাম অফিসের রেকর্ড থেকে কেটে দিল। এমনিতেই তাদের খাতাপত্র দলিল দস্তাবেজের কোনো মা-বাপ ছিল না। সুতরাং জালি (নকল) রেকর্ড তৈরি করতে তাদের কোনো অসুবিধা ছিল না। বংশ পরম্পরায় যারা কোলিয়ারিতে কয়লা কেটে এসেছে, সরকারি হওয়ার পর তারা হয়ে গেল বেকার। এই ব্যাপারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা সাঁওতাল, কুর্মি, বাউরি ইত্যাদিরা। যেহেতু তারা কোলিয়ারির ধাওড়ায় (কুলি কোয়ার্টার) থাকত না, তাদের নাম কেটে দেওয়া সহজ ছিল। অন্যদিকে চাপরাশি, গুণ্ডা পালোয়ানের দল রাতারাতি হয়ে গেল 'সিকিউরিটি গার্ড'। শুধু তাই নয় এরা নিজেদের ভাই, ভাইপো, শালা, কাকা এমন কি গ্রামের লোকেদেরও ডেকে এনে ভর্তি করে কোলিয়ারিতে। আগন্তুকরা অধিকাংশই ছিল বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে আসা রাজপুত, ভূমিহার, ব্রাহ্মণ এবং কিছু কিছু যাদব বা অন্য জাতি। একটা পরিসংখ্যান— এক মাসের মধ্যে ধানবাদের পোস্ট অফিসগুলো থেকে প্রায় ৬০ হাজার টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে। পরবর্তীকালে বড়কর্তারা সরকারি কোল কোম্পানি বিসিসিএল-এর ক্রমবর্ধমান লোকসানের তদন্ত করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন, হাজার হাজার চাপরাশি, কেরানি, মুন্সি, পিওন, বড়বাবু, ছোটবাবু ইত্যাদি পদ নিযুক্ত অনুৎপাদক ম্যানপাওয়ার! এখানে উল্লেখ না করলে ভুল হবে যে, বেশ কিছু বাঙালিও এই নতুন বাবুদের দলে ছিলেন। আমার নিজের মামা যিনি সিজুয়া কোলিয়ারিতে ছোটখাটো ঠিকাদার ছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর হয়ে যান 'লোডিংবাবু'! এই ঘটনা কয়লা অঞ্চলে 'কালা বাঙালি' নামে পরিচিত ছিল। ৭০-এর দশকে কামগার ইউনিয়নের লড়াই ছিল এই 'কালা বাঙালির' বিরুদ্ধে। এ সময়ের লড়াই ছিল আরও বেশি ব্যাপক, আরও রক্তাক্ত। যে সমস্ত কোলিয়ারি তখনও কামগার ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে ছিল, সেগুলোতেও উড়তে লাগল লাল পতাকা। লোহাপট্টি, দামোদর, চাষনালা, কাওরাস, সিজুয়া— একের পর এক কোলিয়ারিতে ঘটল প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ। এবারে শুধু গুন্ডা-পালোয়ান নয় মোকাবিলা ছিল সিআইএসএফ আর সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে— যারা গুলি চালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

এই রকমই এক গুলিতে বিদ্ধ হন গজলিতাঁর কোলিয়ারির চন্দক ভুঁইনি, এক দলিত কামিন। প্রায় একই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল কয়না অঞ্চলের সন্নিহিত ধানবাদ জেলার টিন্ডিরেকে। বহিরাগত (সাঁওতালি ভাষায় 'দিকু')দের দ্বারা আদিবাসীদের জমি দখলের বিরুদ্ধে এক নবযুবক শিবু সোরেনের নেতৃত্বে সাঁওতাল কৃষকেরা চালাচ্ছিল আন্দোলন। ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট অনুসারে আদিবাসীদের জমি কেনা-বেচা বেআইনি। এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনেকদিন থেকেই চলছিল আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরকরণ। এরই বিরুদ্ধে শিবু সরেন বেআইনিভাবে হস্তান্তরিত জমি পুনর্দখলের লড়াই চালাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সরকার, পুলিশ এবং আদালতের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার কোনো চেষ্টারই ত্রুটি রাখে নি। ফলত ধানবাদের জেলগুলো ভরতে লাগল নেংটি পরা সাঁওতালদের দিয়ে।

এগিয়ে এলেন ব্যতিক্রমী এ কে রায়। বিধানসভায় প্রশ্ন তোলা, আদালতে আইনি লড়াই, টুন্ডির গ্রামে গ্রামে মিটিং করা কোনোটাই বাদ পড়ল না। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আর একটা কাজ করলেন তিনি, ধানবাদের সংখ্যাবহুল কুর্মি মাহতদের নেতা বিনোদবিহারী মাহত এবং শিবু সরেনকে নিয়ে গঠন করলেন 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'। এ কে রায় আজ নেই, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা আজও আছে। যদিও যে আদর্শ, স্বপ্ন,

আর উদ্দীপনা নিয়ে সেই মোর্চা গঠিত হয়েছিল, তার কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সে কথা পরে।

বিভিন্ন রকমের খনিজ সম্পদ আর ঘন বনজঙ্গলে ভরা বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত। এক সময়ে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতি এবং কুর্মি, বেউরি, মুচি, মোহলি ইত্যাদি তথাকথিত ছোট জাতেরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কাঠ এবং অন্য বনজ সম্পদ এবং চাষের জমির লোভে ১৯ শতকের শেষ থেকে বাংলা এবং বিহার থেকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত, ভূমিহার, গোয়ালা, বেনিয়া এবং মুসলমানদের অনুপ্রবেশ এখানে ঘটতে থাকে। বিশ শতকে কয়লা, লোহা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদের আহরণ শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা। স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের জোয়ার শুরু হয়। স্থাপিত হয় ইস্পাত, সার, ভারী যন্ত্রপাতির বড় বড় কারখানা, দামোদর, বরাকর ইত্যাদি নদীর ওপর তৈরি হয় বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। খনিগুলোতে হতে থাকে বিস্তার, বাড়তে থাকে উৎপাদন, হাজার হাজার আদিবাসী এবং মূলবাসীরা হারায় জল, জমি, জঙ্গল। নিজভূমে পরবাসী এই সব বাস্তুহারাদের অসন্তোষ ধীরে ধীরে রূপ নেয় ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে। বামপন্থী, মধ্যপন্থী, দক্ষিণপন্থী— সমসাময়িক সব রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। লালু যাদব বলেছিলেন, 'হমারা নাম কে উপর হি ঝাড়খণ্ড বন সকতা হ্যায়', সিপিএম বলেছিল, এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।

এ কে রায় বোধহয় এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মধ্যে সংহতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। ধানবাদ কয়লা অঞ্চলের স্থায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ছিল বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত হিন্দিভাষী হরিজনরা। অন্যদিকে গুন্ডা, পালোয়ান, ঠিকাদার আর তাদের পৃষ্ঠপোষক আইএনটিইউসি, এইচএমএস নেতারাও ছিলেন হিন্দিভাষী। ১৯৫৮ সালে স্টেন রিঅর্গানাইজেশন কমিটি–র সামনে ধানবাদ জেলাকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ছিল যে, এই হিন্দিভাষী নেতারা যে জনসমাবেশ করেছিল তার অধিকাংশই ছিল হিন্দিভাষী খনিশ্রমিক। ঝাড়খণ্ডের সমর্থনে আসা মুষ্টিমেয় গ্রামের লোককে তারা তাড়িয়ে দেয়। কমিশনের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগও পায় না হতভাগ্য ঝাড়খণ্ডীরা। হিন্দিভাষার জিগির তুলে ধানবাদের মাফিয়াচক্র অনেক সময়ই বিহার খনিশ্রমিকদের নিজেদের দলে টানতে সমর্থ হয়। এমন পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন মজদুর আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করবে, এই ভয় অনেক বামপন্থীর মধ্যে ছিল। প্রথাগত 'শ্রেণীসংগ্রাম'–এ বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীদের পক্ষে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মধ্যে দলিত শোষিত সম্প্রদায়ের সংহতির সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এ কে রায় প্রথাগত মার্ক্সবাদী ছিলেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন 'জমিন কে সাথ জুড়া হুয়া আদমি'। তিনি বুঝেছিলেন হিন্দিভাষী উঁচু জাতের মাফিয়াদের থেকে হিন্দিভাষী দলিত মজদুরদের আলাদা করা সম্ভব। গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে ওই দলিত শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংগ্রামে আশেপাশের গ্রামের সাঁওতাল, কুর্মি, বাউরিদের সক্রিয় সমর্থন তিনি আদায় করেছিলেন। তাই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সমর্থনে হিন্দিভাষী মজদুরদের জমায়েত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। অন্যদিকে দলিত আদিবাসী এবং মূলবাসীদের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' নয় বরং শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামেরই একটা রূপ একথা প্রমাণ করতে তিনি মার্ক্সবাদকে ব্যবহার করতে ভুললেন না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখলেন, তাঁর অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের তত্ত্ব। স্লোগান দিলেন— 'ঝাড়খণ্ড লালখণ্ড হোগা'। শুরু হল 'লাল হরা মৈত্রী'— শ্রমিকের রং লাল আর ঝাড়খণ্ডের রং হরা অর্থাৎ সবুজ।

১৯৭১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'। এই নামটির মধ্যে প্রতিফলিত হয় একটা বিশেষ চিন্তাধারা, একটা বিশেষ স্বপ্ন। ঝাড়খণ্ড পার্টি নয়, হুল ঝাড়খণ্ড নয়, ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চাও নয়। শোষণমুক্ত ঝাড়খণ্ডের জন্য চাই 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'।

প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি ধনিকদের গল্‌ফ গ্রাউন্ডে ঝাড়খণ্ড দিবসের বিশাল সমাবেশে অথবা আশেপাশের গ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের মিটিং, মিছিল, তীরধনুক সজ্জিত সাঁওতাল আর কুর্মিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আওয়াজ উঠত হাজার হাজার হিন্দিভাষী বিহারিশ্রমিক 'ঝাড়খণ্ড রাজ হমারা হ্যায়'। ঠিক তেমনি মে দিবসের মিটিংয়ে দেখা যেত লালঝান্ডা কাঁধে সাঁওতালদের আওয়াজ উঠত 'দুনিয়া কে মজদুর এক হো।'

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার গঠন করেছিলেন তিনজন— এ কে রায়, বিনোদবিহারী মাহত আর শিবু সরেন। কেউ কেউ বলত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই ব্রহ্মা অর্থাৎ এ কে রায় কিন্তু ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সদস্য ছিলেন না। তিনি চাইলে অনায়াসেই নতুন প্রেসিডেন্ট অথবা সেক্রেটারি অথবা অন্য কোনো বড় পদ পেতে পারতেন। সমর্থকেরা অনেকে চাইছিলেনও তাই। কিন্তু রায়বাবু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ রায়বাবুর নিজের ভাষায়, 'আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতেই শিবু সরেন আর

বিনোদবাবুর মতো আদিবাসী, দলিতদের নেতার পদে আনতে পারি নি। কমিউনিস্ট পার্টি তো আমার মতো উঁচু জাতের ভদ্রলোকেদের। এর ওপর ওদের পার্টিতে আমি গেলে আমিই ওদের নেতা হয়ে যাব। সেটা হবে একটা অপরাধ।' আবার সেই নৈতিকতা, সেই ব্যতিক্রম।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৮ নাগাদ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় ভাঙন ধরে। বিনোদবাবুকে হটিয়ে শিবু সরেন পার্টির সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ১৯৮০-র নির্বাচনের আগে শিবু নির্বাচন কমিশনের কাছে তীরধনুক প্রতীক চিহ্ন দাবি করে। এ কে রায় তীরধনুক চিহ্ন নিয়ে দুটো বিধানসভা এবং একটা লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন এবং জিতেছিলেন। নির্বাচন কমিশনার লিখিতভাবে এ কে রায়ের কাছে জানতে চায়, তাঁর কোনো আপত্তি আছে কিনা। রায়বাবু জানিয়ে দেন তাঁর কোনো আপত্তি নেই। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে তিনি কখনো সিঁড়ি ছাপ, কখনো বই ছাপ, কখনো কোদাল ছাপ নিয়ে লড়েছেন। কখনো কখনো জিতেছেন, অনেকবার হেরেছেন। সমর্থকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, 'হাজার বছর ধরে তীরধনুক আদিবাসীদের প্রতীক। আমার বাপদাদারা কেউ কখনো তীরধনুকের ব্যবহার করে নি, আদিবাসীরা আজও করে। শিবু একজন আদিবাসী, তীরধনুকে ওর জন্মসিদ্ধ অধিকার, আমার নয়।'

৭৪-৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনে বিধায়কেরা পদত্যাগ করতে শুরু করেন। সিন্ধ্রি থেকে নির্বাচিত বিহার বিধানসভার সদস্য এ কে রায় এই পদত্যাগকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন। ইমার্জেন্সিতে জেলে থাকা অবস্থায় জয়প্রকাশের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও হয়। ৭৭-এ নির্বাচনের আগে সারা দেশে যখন জেপি আন্দোলনের জোয়ার, তখন স্বয়ং জেপির কাছ থেকে প্রস্তাব আসে নির্দল এ কে রায় জনতা পার্টির চিহ্ন নিয়ে ধানবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়ুন। এ কে রায় সবিনয় সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সবাদী সমন্বয় সমিতির তরফ থেকে তীরধনুক চিহ্ন নিয়ে লড়েন এবং প্রায় ৬০% ভোট পেয়ে জয়ী হন। একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁকে এ কে রায় অথবা রায়বাবু বলে বারবার উল্লেখ করেছি। তাঁর পুরো নাম অরুণকুমার রায়। কিন্তু কেন জানি না কেউ তাঁকে অরুণদা, অরুণবাবু অথবা অরুণ বলে কখনো সম্বোধন করে নি। জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু, মমতাদিদি আমরা হামেশাই শুনি। এমনকি বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, সিদ্ধার্থ রায় কেউই তাঁদের মা-বাবার দেওয়া নামটা হারান নি। এ কে রায়ের বেলায় তা হয় নি। তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দের অনেকেই অরুণ নামটা শোনেও নি। হয়তো এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা। একটা জিনিস অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, উনি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ পীড়াপীড়ি না করলে কখনো কিছু বলতেন না। তাঁর বাড়ি কোথায় ছিল, কে কে ছিলেন বাড়িতে, কোথায় পড়াশোনা করেছিলেন, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা— এ সম্বন্ধে ছেঁড়া ছেঁড়া অনেক সময় পরস্পরবিরোধী বিবরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। কেউ লিখেছেন উনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বলে মেকানিক্যাল, কারও মতে উনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অন্যরা বলে কলকাতা সায়েন্স কলেজের। এক সাংবাদিক (উনি মারা যাওয়ার পর) জানিয়েছেন, রায়বাবু জার্মান ভাষাও শিখেছিলেন। নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতেন না বলেই হয়তো তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল অনেক কল্পকাহিনী। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে কয়েকটি উপন্যাস— হিন্দি এবং বাংলায়। একবার এক ভক্ত তাঁকে অনুরোধ করে আত্মজীবনী লেখবার জন্য। মৃদু হেসে তিনি উত্তর দেন, 'আমার ঢাক আমাকেই পেটাতে হবে? তোমরা লিখবে না আমার জীবনী?'

ঢাক পেটানোর প্রতি এই অনীহার জন্ম বোধহয় তাঁর প্রবল আত্মসম্মান বোধ থেকে। একবার তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন মোজেসের টেন্‌থ কমান্ডমেন্ট-এর একটা কমান্ডমেন্ট নাকি 'Don't bow down your head before anybody, not even before me.' সত্যি মিথ্যে জানি না। কিন্তু রায়বাবু বোধহয় এই কমান্ডমেন্টটাকে জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলেন। লাগাতার অনেকগুলো ইলেকশনে পরাজয়ের পর লালু যাদবের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছিল, তাঁকে রাজ্যসভার মেম্বার করার জন্য। লালুর তখন রমরমা। চাইলে একটা ইটপাথরকেও রাজ্যসভায় পাঠাতে পারতেন। রায়সাহেয়ের জবাব ছিল 'আমি ব্যাকডোর দিয়ে এমপি হতে চাই না।'

৭৫-এ আরও অনেক নেতার সঙ্গে এ কে রায় এবং বিনোদ মিশ্রকে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। শিবু সরেনকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল টুণ্ডি কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন সাঙ্ঘাতিক ধারায়— লুঠ, হত্যার ষড়যন্ত্র, অস্ত্র ছিনতাই ইত্যাদি। তৎকালীন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র শুরু করল লাঠির নীতি। কংগ্রেসে যোগ দাও, মাপ চাও, সব মামলা তুলে নেওয়া হবে, জেল থেকে ছাড়া পাবে। অন্যথা মিসা লাগানো হবে। শিবু সরেন নতি স্বীকার করলেন, জেল থেকে ছাড়া পেলেন। জগন্নাথ মিশ্রের অনুচররা তাকে ঘিরে রাখল, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় ধরল ভাঙন। ১৯৮০ সালে শিবু দুমকা থেকে এবং

এ কে রায় ধানবাদ থেকে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু ততদিনে মুক্তি মোর্চার ভাঙন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। ১৯৮১–তে মুক্তি মোর্চার অধিবেশন হল ধানবাদের সরাইচেলায়। তৈরি হল, নতুন সংবিধান। প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হল লাল ঝাণ্ডার সঙ্গে মুক্তি মোর্চার কোনো সম্পর্ক নেই। 'লাল হরা মৈত্রী' ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। জঙ্গিরা কেউ কেউ রায়সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছিল, 'শিবুর সঙ্গে দেখা করুন, ও তো আপনার শিষ্য, ও ভুল করেছে, ওকে বোঝান।' এ কে রায় রাজি হন নি। 'শিবু যদি নিজে আসে, আমি কথা বলব, আমি যাব না।' শিবু এসেছিল। ২১ জুলাই মৃত্যুশয্যায় শায়িত রায়বাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। এ কে রায় সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা লিখলাম। তাই বলে দোষত্রুটি কি তাঁর ছিল না? ছিল নিশ্চয়ই, মানুষ যখন। অনেকবার তাঁকে অকারণে রাগতে দেখেছি, সাথীদের প্রতি রূঢ় আচরণ করতে দেখেছি। নিজে যাকে ভাল মনে করতেন, তাকে পক্ষপাতিত্ব করতে দেখেছি। কিন্তু বড় কাছ থেকে দেখেছি আমি তাঁকে, তাই তাঁর ভুলগুলো আর মনে পড়তে চায় না। বিশেষ করে আজ যখন উনি আর আমাদের মধ্যে নেই। ওঁর সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই চোখে ভেসে ওঠে ওঁর হাস্যময় মুখটা। আর মনে পড়ে শক্তি মাহাত, শঙ্কর গুহনিয়োগী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, রসিক হাঁসদার মতো তাঁর শিষ্যদের, গুণ্ডাদের আক্রমণে শহিদ হওয়ার পর রাগে বিক্ষোভে থমথমে তাঁর মুখ। চোখের সামনে তিনি তাঁর স্বপ্নের ঝাড়খণ্ডকে লালখণ্ডের বদলে গেরুয়া খণ্ডে পরিণত হতে দেখলেন। যে অসহায় কয়লা মজদুর আর গ্রামের গরিবদের তিনি গুণ্ডাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস দিয়েছিলেন, তারা বিজেপির প্রার্থী এক অজানা অচেনা গৃহবধূ রীতা বর্মাকে (রীতা বর্মা পুরুলিয়া কর্মকাণ্ডে মারা যাওয়া এসপি কর্ণধার বর্মার স্ত্রী) ইলেকশনে ধানবাদ থেকে জয়ী করে পাঠাল। সারা দেশে বামপন্থার বিপর্যয় আর দক্ষিণপন্থার সদর্প অগ্রগতি— এ সবই তিনি দেখেছেন তাঁর টালি ছাওয়া ঘুপচি ঘরে বসে। আধো অন্ধকারে বিষণ্ণ একাকী তাঁর সেই উদাস চোখের স্মৃতি এত স্পষ্ট আমার মনে যে, তাঁর ভুলগুলো আর মনে পড়তে চায় না। হয়তো কোনোদিন কোনো নিরপেক্ষ লেখক দোষগুণ ভাল–মন্দ মেশানো মানুষ এ কে রায়ের পূর্ণাঙ্গ ছবিটি ভবিষ্যতের পাঠকদের কাছে তুলে ধরবেন। সে কাজ আমার দ্বারা হবে না।

তাঁর নিজের এবং সমগ্র বামপন্থার বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে তিনি অনেক ভেবেছেন, কিছু কিছু লিখেছেন। ১৯৯৬ সালে কামগার ইউনিয়নের এক সভায় তিনি আক্ষেপ করেছিলেন 'সারা দেশে শ্রমিক–অধ্যুষিত লোকসভা আসন— আসানসোল, রাঁচি, জামশেদপুর, হাওড়া, ভূপাল, বম্বে— এই সব জায়গায় শ্রমিকেরা বামপন্থীদের ছেড়ে দক্ষিণপন্থীদের জয়ী করল। এটা কীভাবে হল। শ্রমিকেরা তাদের চিরকালের সাক্ষী লালঝাণ্ডাকে ত্যাগ করে বরণ করে নিল দক্ষিণপন্থীদের, যারা বরাবর শ্রমিকদের শোষণ করে নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এই বিপর্যয়ের আশঙ্কা তিনি করেছিলেন অনেক আগেই। ১৯৮৩ সালে লোকসভার সদস্য থাকাকালীন ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় তিনি 'কামগার ইউনিয়ন কোন পথে?' নামক একটা রচনা পাঠ করেন। তাতে শ্রমিক আন্দোলনের, বামপন্থার ভুলত্রুটি আলোচনা করেছিলেন। ভুলত্রুটি শোধরাবার কিছু কিছু পন্থারও দিশা নির্দেশ করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রয়াস সফল হয় নি।

বিগত ২০–৩০ বছর ধরে বামপন্থার পতন এবং দক্ষিণপন্থার বিজয় নিয়ে অনেক বই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেশে বিদেশে। লেখকেরা বিখ্যাত ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক। তাঁরা এ কে রায়ের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী, দক্ষ। তাঁদের অনেক বিশ্লেষণ হয়তো সঠিক, হয়তো নয়। তাদের আলোচনায় ভবিষ্যতের কোনো পথনির্দেশ আছে কিনা আমার জানা নেই। আদৌ আছে কি? হয়তো বামপন্থা, মার্ক্সবাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। হয়তো ভবিষ্যতে নতুন কোন পন্থা, নতুন কোন 'বাদ'–এর জন্ম দেবে, যার মধ্যে নিহিত থাকবে মার্ক্সবাদের

মূলবাণী— 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'। হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্ম 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার' সৈনিকদের পুনরায় স্মরণ করবে। সেই তালিকায় এ কে রায়ের নাম থাকবেই, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উমা

নতুন দুই বই

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

বন্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে উৎস মানুষ প্রকাশ করল নতুন দুটি সঙ্কলনগ্রন্থ।

গণ–উন্মত্ততা

শঙ্করনারায়ণ দাস

ইদানীং নানা ছুতোনাতায়, উপলক্ষে বা দুরুপলক্ষে জনরোষ ভীষণ তীব্র হতে দেখা যাচ্ছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, মালমশলা সব তৈরিই থাকে, শুধু ঘটনা একটা ঘটার অপেক্ষা। তারপরই প্রলয়ঙ্করী কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। কখনো ভাঙচুর, কখনো গণধোলাই, কখনো বা দাঙ্গা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুলিশকে পেটানো, শিক্ষকনিগ্রহ ইত্যাদি। কথায় কথায় জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ভালো–মন্দ জ্ঞান থাকছে না। কোথাও হয়তো আগুন নেভানোর জন্য দমকল আসতে একটু দেরি হয়েছে। আর যায় কোথায়! ঐ একটু দেরি হওয়ার জন্য দমকলকর্মীদের ওপর হামলা। এদিকে আগুন জ্বলছে, ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। আর ওদিকে দমকলের লোকেরা নিগৃহীত হচ্ছেন। কখনো বা পুলিশ এসেছে দুষ্কৃতী ধরার জন্য। ব্যস, দুষ্কর্ম হল কেন, তার জন্য পুলিশকে ধরে পেটাও!। ভাবখানা এমন, যেন দুষ্কৃতীরা সবাই পুলিশের চেনা, পুলিশ ইচ্ছে করেই তাদের ধরে না। ধরলে সেই বিশেষ দুষ্কর্মটা হোত না। অতএব পুলিশকেই...। আরে যে লোকটা বাজারে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সবজিওলার সঙ্গে বেগুনের দাম নিয়ে তর্ক করছিল, তাকে কি তখনই দুষ্কৃতী বলতেন? সেই লোকটাই যদি অন্য কোনো দোকান থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেতে লাগল, তখনি আপনি বুঝে গেলেন যে আপনার সহখদ্দের একজন দুষ্কৃতী। আর সেই চোরকে পিটিয়ে রক্তাক্ত, আধমরা বা ধরুন মেরেই ফেলল, সেই গুটিকয় লোক? তারা কি দুষ্কৃতী নয়? চোর না হয় চুরি করতে এসেছিল। কিন্তু চোরপেটানো লোকগুলো তো চোর মারার জন্য বাজারে আসে নি। তাদের কেউ খদ্দের, কেউ বা দোকানদার, কেউ সাধারণ লোক। চোর পিটিয়ে মেরে ৩০২ ধারার আসামী হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বলবে, যে চোর ধরা পড়তে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। এই 'মাথা ঠিক রাখতে পারে নি' এমন লোকসংখ্যা যখন অনেক বেশি হয় এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রত্যক্ষভাবে কোনো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে জনরোষ বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই জনরোষ ম্যাস হিস্টিরিয়া বা গণ–উন্মত্ততায় পরিণত হয় এবং পুরোটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চুরি, ডাকাতি, ছেলেধরা, খুন ইত্যাদি নানা কারণে সন্দেহভাজন লোকের ওপর জনতা চড়াও হয় আর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে 'অপরাধীকে' মারধর করা শুরু করে। গণহারে শাস্তিপ্রাপ্ত সেই হতভাগাকে গুরুতর আহত হয়ে অনেক সময় মারাও পড়তে হয়। সময়মতো পুলিশ এলে অথবা আশেপাশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন বেশি থাকলে সে বেচারা জনরোষের হাত থেকে রক্ষা পায়।

শুধুমাত্র এরকম এক বা একাধিক অপরাধীর তাৎক্ষণিক শাস্তিপ্রদানই নয়, অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটা 'ইস্যু' নিয়ে বিপুল সংখ্যায় জনসমাগম দেখা যায়, যাকে আমরা গণ–আন্দোলন বলি। সেই গণ–আন্দোলন প্রথম অবস্থায় শান্তিপূর্ণই থাকে। অনেক সময় বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোনো প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে অহিংস আন্দোলন মুহূর্তের মধ্যে হিংসাস্রয়ী হয়ে ওঠে। উন্মত্ত জনতা কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে সরকারি বেসরকারি জিনিস ভাঙচুর করা শুরু করে। আগুনও ধরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষও তার থেকে রেহাই পায় না। মানুষের যার যেমন চরিত্র সেই অনুযায়ী তারা গণহারে সেরকম আচরণ করতে থাকে। যেমন, যারা ধ্বংসকামী, তারা সামনে যা পায় সব ভাঙচুর করা শুরু করে। যারা ধর্ষকামী তারা ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের শ্লীলতাহানি এবং নিগ্রহ করে। যারা ক্লেপটোম্যানিয়াক বা চুরিবাতিকগ্রস্ত তারা গোলমালের সুযোগে লোকের ঘড়ি গয়না মোবাইল ফোন মানিব্যাগ হস্তগত করার ধান্দায় থাকে। যারা ভীতু স্বভাবের, তারা গোলমালের সম্ভাবনা আছে দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। হয়তো কথা–কাটাকাটি ছাড়া সেখানে আর কিছু হয়ই নি, তবুও ভীতু প্রকৃতির লোকেরা আগেভাগেই দরকারি

কাজ না করে বা অসমাপ্ত রেখেই সেই স্থান ত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য, গুজবটুজবগুলো এই জাতীয় লোকেদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে। আর যারা ডাকাবুকো চরিত্রের, তারা সাতপাঁচ না ভেবেই গোলমালে জড়িয়ে পড়ে। তার জন্য অনেক সময় এরা বিপদেও পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ফলে প্রাথমিক অভিঘাতটা এই ধরনের লোকেরাই ভোগ করে। এরা আহত হয়, কারো অঙ্গহানি হয়, বেঘোরে মারাও পড়ে অনেকে। অনেক সময় পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, পুলিশের লাঠি খায়। আবার কেউ কেউ আছে, যারা দূরে দাঁড়িয়ে স্রেফ মজা দেখে। উস্কানি দেয়, তারপর ঝামেলা পাকিয়ে দিয়ে সরে পড়ে।

বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণ-উন্মত্ততা ঘটতে পারে। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মিছিল, জন সমাবেশ, ছেলেধরা, চোর ডাকাত বাটপার ধরা পড়া, সড়ক দুর্ঘটনা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরবর্তী অচলাবস্থা, রোগীমৃত্যু, রেশনে অব্যবস্থা, এমনকি কোনো আনন্দানুষ্ঠান থেকেও এমনটা ঘটে যেতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, এই গণহিংসা এবং গণ-উন্মত্ততার কারণ কী? এককথায় এর কারণ হল মানুষের মনের মাত্রাতিরিক্ত চাপ বা স্ট্রেস। যদিও এই ছোট কথায় এর ব্যাপকতা বোঝা যাবে না। আমরা ধাপে ধাপে এটা বোঝার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা নানান চাপের মধ্যে বসবাস করি। শিশুকাল থেকেই আমাদের এই চাপ নেওয়া শুরু হয়। পরীক্ষায় ভালো ফল করার চাপ, স্কুলের পাঠ শেষে ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার চাপ, উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়ার চাপ, তারপর ভালো চাকরি কিংবা ব্যবসা করে ভালো অর্থ উপার্জনের চাপ, শরীরে যৌবন আসার পর সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সান্নিধ্য পাওয়া না-পাওয়ার চাপ, তার সঙ্গে বিয়ে হবে কি হবে না সেই অনিশ্চয়তার চাপ। এর সঙ্গে আছে রোগব্যাধির আক্রমণ আর তার চিকিৎসার চাপ। সমাজের যারা গণ্যমান্য লোক, তাঁরা সম্মানহানির হওয়ার চাপে থাকেন। অনেকেই এঁদের কাছে বিভিন্ন কারণে পরামর্শ নিতে আসেন। সেই সুবাদে পরামর্শদাতার স্বাস্থ্যেরও খবর নেন। কোনো কারণে সেইসব পরামর্শপ্রার্থী লোকজনের আনাগোনা কমে গেলে বা কেউ তাঁকে পাত্তা না দিলে সেটা সেই বিশেষ ব্যক্তির মনে একটা চাপের সৃষ্টি করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপও মানুষের শরীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে আলোচনার আগে জন কলহনের ইঁদুর নিয়ে একটা পরীক্ষার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইঁদুরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি পাঁচ হাজার ইঁদুর থাকার মতো করে, পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার এবং পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা, অবাধ বিচরণ এবং মেলামেশা করার পরিবেশ, সর্বোপরি ওদের থাকার উপযোগী প্রকোষ্ঠ, যাওয়া আসা করার জন্য ঢালু রাস্তা সম্বলিত একটা আবদ্ধ কক্ষ তৈরি করে সেখানে চার জোড়া প্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুর রেখে দিলেন। ইঁদুরের এই স্বর্গরাজ্যে তারা বহাল তবিয়তে জীবনযাপন আর বংশবৃদ্ধি করতে লাগলো। ৫৬০তম দিন ওদের সংখ্যা ২২০০-তে পৌঁছে গেল। আর তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে ধীরে ধীরে তাদের ক্রম অবলুপ্তির পর্যায় শুরু হয়ে গেল। মুরুব্বিগোছের পুরুষ ইঁদুরগুলো অস্বাভাবিক আগ্রাসী হয়ে উঠল। কিছু ইঁদুর দলবদ্ধভাবে স্ত্রী ইঁদুর এবং বাচ্চাদের আক্রমণ করা শুরু করল। তাদের সহবাস প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কিছু ইঁদুর সমকামী হয়ে গেল, বাকিরা কিছু অতিকামী আর কিছু উভকামী হয়ে উঠল। অবস্থা এমন হল যে, দেখা হলেই লিঙ্গনির্বিশেষে যৌনসঙ্গম করার প্রবণতা দেখা যেতে লাগল। মা ইঁদুর তাদের বাচ্চাদের প্রচণ্ড অবহেলা করতে লাগল, পরিপাটি করে বাসা বানানো ভুলে গেল, বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর ফেলে চলে যাওয়া এমনকি তাদেরকে আক্রমণ করা শুরু করল। শিশুমৃত্যুর হার বাড়তে বাড়তে একসময় ৯৬ শতাংশে গিয়ে পৌঁছল। বাচ্চাদের মৃতদেহ বড়োরা খেতে শুরু করল। আর যারা একটু কমজোরি তারা আহার-বিহার যৌনক্রীড়া ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজে নিস্পৃহ হয়ে পড়ল। গায়েগতরে বেঁচে রইলো ঠিক, কিন্তু ওদের স্বভাবের বিপুল পরিবর্তন ঘটল। পরের দিকে এই ধরনের ইঁদুরের সংখ্যাই বেশি ছিল। জন্মদানে অক্ষম, শয়ে শয়ে ইঁদুর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ভুলে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করল। এমনকি, যখন পরস্পর মারামারি, স্বজাতিভক্ষণ ইত্যাদি কারণে তাদের সংখ্যা কমে গিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখনও পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে এল না। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় নেমে আসার পর ইঁদুর ইঁদুরীর প্রাকৃতিক বোঝাপড়া এবং যৌনক্রীড়া যা বংশবৃদ্ধির সহায়ক সেটা স্থায়ীভাবে থেমে গেল।

বিষয়টা একটু অন্যভাবে দেখা যাক। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর চারপাশে একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কাল্পনিক বৃত্ত জুড়ে সেই প্রাণীর সচ্ছন্দ গতিবিধি বজায় থাকে। এই কাল্পনিক বৃত্তটাকে তার নিজস্ব এলাকা (পার্সোনাল স্পেশ) বলে। এক এক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই এলাকা বা স্পেস এক এক মাপের হয়। কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ প্রাণীর সংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী এর কমবেশি হয়। যেমন, আফ্রিকার সিংহের ক্ষেত্রে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কমবেশি পঞ্চাশ কিমি। অর্থাৎ আফ্রিকান সিংহ তার চারদিকের পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অন্য কোনো

দলের সিংহ কিংবা তার মতো চেহারার মাংসাশী প্রাণীর বিচরণ পছন্দ করে না। এরকম প্রতিটি প্রাণীরই নিজস্ব এলাকা বা পার্সোনাল স্পেস রয়েছে। তবে আমরা যেহেতু আমাদের অর্থাৎ মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই সরাসরি মানুষের স্পেস নিয়েই কথা বলি।

অন্যান্য প্রাণীদের মতো মানুষও একটা নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে বসবাস করে। সে যেখানেই যাক সে তার নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে অন্য লোকের উপস্থিতির দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়। মানুষ যে পরিবেশে জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠে, সেখানকার জনবসতির ঘনত্ব, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর এই কাল্পনিক বৃত্তের পরিমাপ নির্ভর করে। আবার দেশভেদেও সংস্কৃতি অনুযায়ী এর কমবেশি হয়। গ্রাম, শহর, আধাশহর, মেট্রো শহর, শহরতলি, বস্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর পরিধির হেরফের হয়। গড়পড়তা হিসেবে শহরতলি অঞ্চলের মধ্যবিত্ত কোনো লোকের চারদিকে একটা বায়বীয় গোলক ধরে নিয়ে তাকে চারটে জোন-এ ভাগ করা যায়।

১) ইন্টিমেট জোন (অন্তরঙ্গ বৃত্ত): শরীরের ৬ ইঞ্চি দূর থেকে ১৮ ইঞ্চি দূর পর্যন্ত এই এলাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গাটাকে প্রত্যেকেই একান্ত নিজস্ব জায়গা হিসাবে সুরক্ষিত রাখে। বাবা মা, ভাইবোন, নিজের সন্তান, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয় এই এলাকায় ঢুকতে পারে। শরীর থেকে ৬ ইঞ্চি দূর পর্যন্ত আরো একটা 'সাব জোন' রয়েছে। এর নাম 'ক্লোজ ইন্টিমেট জোন'। যাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক থাকে, যাদের কোলেপিঠে নেওয়া হয় বা গা ঘেঁষে বসা শোয়া যায়, কেবলমাত্র তারাই এই বৃত্তের ভেতরে আসে।

২) পার্সোনাল জোন (ব্যক্তিগত বৃত্ত) : শরীরের ১৮ ইঞ্চি দূর থেকে শুরু করে ৪৮ ইঞ্চি দূর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। নানারকম পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, সমবেত পানাহার, অফিস পার্টি ইত্যাদি এর আওতায় পড়ে।

৩) সোশ্যাল জোন (সামাজিক বৃত্ত) : ৪৮ ইঞ্চি বা ৪ ফুট দূর থেকে ১২ ফুট দূর পর্যন্ত এর বিস্তার। স্বল্পপরিচিত অথবা অপরিচিত কিন্তু বিভিন্ন কাজের সুবাদে যারা আমাদের কাছে আসে, তারাই এই বৃত্তে পড়ে। যেমন, বিভিন্ন কাজের মিস্ত্রি, ধোপা, মুদি, কাজের মাসি, ডাকপিয়ন, ডেলিভারি বয় ইত্যাদি।

৪) পাবলিক জোন (সার্বজনীন বৃত্ত) : ১২ ফুট বৃত্তের বাইরে যে এলাকা সেটাই 'পাবলিক জোন'। ছোটো বড় জনসমাবেশ, কোনো বিশেষ ক্লাস বা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের শ্রোতারা এই এলাকায় পড়েন।

ঘিঞ্জি বস্তি এলাকার লোক এবং সাধারণ শহরতলি অঞ্চলের লোকে ক্ষেত্রে ইন্টিমেট জোন আর পার্সোনাল জোন-এর সীমানার কিছু হেরফের হতে পারে। আবার কলকাতার মতো শহরের শহরতলি আর জেলার অন্য শহরতলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সাধারণত দু ধরনের মানুষ ইন্টিমেট জোন এবং ক্লোজ ইন্টিমেট জোন-এ আসতে পারে। এক, আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর আত্মীয়, বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং সহমতের ভিত্তিতে যৌন সংসর্গে ইচ্ছুক অথচ আপাত অপরিচিত (বারবনিতা, কলগার্ল, কলবয়)। এছাড়া নাপিত, বিউটিশিয়ান, ম্যাসিওর, ফিজিওথেরাপিস্ট, ডাক্তার, নার্স এরাও এই জোনে আসেন, যেহেতু আমরা এদের কাছ থেকে পরিষেবা নিই। দুই, যারা আমাদের শত্রু তারা শারীরিক আঘাত করা বা হত্যা করার জন্য ইন্টিমেট জোনে আসতে পারে। অপরিচিত কেউ যদি আমাদের শরীরের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন সহজাত প্রবৃত্তিতেই আমাদের ভেতর শারীরবৃত্তীয় কিছু পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়, অ্যাড্রিনালিন হরমোন ক্ষরিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। এর ফলে মস্তিস্কের কোনো কোনো অঞ্চল সক্রিয় হয়ে ওঠে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পেশি সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। বলতে গেলে পুরো শরীরটাই সম্ভাব্য বিপদের মোকাবেলা করার জন্য কিংবা পলায়ন করার জন্য তৈরি হয়।

আমরা যদি অপরিচিত আগন্তুককে গ্রাহ্য না করি কিংবা কাছাকাছি আসাটা মেনে নিই তথাপি অবচেতন মনে শরীরে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জনঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে পরিস্থিতির চাপে ইন্টিমেট জোন এবং ক্লোজ ইন্টিমেট জোন-এ কোনো অচেনা আগন্তুকের উপস্থিতি মেনে নিতে হয়। অনেক সময় তাদের চেহারা, গায়ের গন্ধ, হাবভাব ইত্যাদি পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও ভীড় বাসে ট্রেনে, হাটেবাজারে বা অন্য কোথাও গিজগিজে মানুষের ভীড়ে গায়ে গা ঘেঁষে থাকা আমরা বরদাস্ত করতে বাধ্য হই। কিন্তু অবচেতনে শারীরিক ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। ক্রমাগত এরকম চলতে চলতে আমাদের দেহে মনে একটা চাপ ঘনীভূত হতে থাকে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সভ্যতা ইত্যাদির জন্য এই মানসিক চাপ সবসময় উন্মুক্ত হতে পারে না। মানসিক চাপ রিলিজ বা মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাটাও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মস্তিষ্কও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে চাপ আরো বেশি হয়।

মানসিক চাপ মোচন করার ব্যবস্থা আমাদের শারীরতত্ত্বেই রয়েছে। এটা অনেকটা প্রেসার কুকারের সেফটি ভ্যাল্‌বের

মতো। চাপ বেশি হলে হাসি, কান্না, রাগ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে আমরা চাপমুক্ত হই। এসব উপায়ে যাদের চাপমুক্তি ঘটে না, তাদের শরীর মনে কিছু রোগব্যাধি (সাইকোসোমটিক ডিজিজ) এবং মানসিক সমস্যা (মেলানকোলিক ডিজঅর্ডার) দেখা দেয়। আত্মপীড়ন (স্নান খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের উপর অত্যাচার) এবং আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চাপ সহ্য করার একটা সীমা আছে। ধরা যাক, একটা কেটলিতে জল ভরে উনুনে বসালে জল গরম হতে হতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় পৌঁছলে তা ফুটতে শুরু করবে। কিন্তু জলটা যদি আগে থেকেই পঞ্চাশ বা ষাট ডিগ্রি তাপমাত্রায় থাকে তাহলে অল্প একটু গরম করলেই একশোতে পৌঁছে ফুটতে শুরু করবে। আমাদের চাপ সহ্য করার বিষয়টাও সেরকম। গড়পড়তা মানুষের জীবনে কী কী সমস্যা আছে, তা আমরা জানি। তার প্রধান তিনটে সমস্যার সমাধান না হলেই তার চাপ সহ্যসীমার অর্ধেকের বেশি মাত্রায় পৌঁছে যায়। যেমন, ১) কেউ যদি ভালো চাকরি কিংবা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতে না পারে। ২) প্রেমে বা বিবাহিত জীবনে অসুখী থাকে, এবং ৩) ক্রনিক কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তার চাপ সহ্যশক্তি চরমসীমার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সেই সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে জীবিকার তাগিদে বাইরে বের হয়ে বাসে ট্রামে ট্রেনে অপরিচিত লোকের ইন্টিমেট জোন বা ক্লোজ ইন্টিমেট জোন–এ চলে আসাটা তার মনে একটা চাপা বিরক্তি আর অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য, দীর্ঘদিন যাবৎ সমাধান না হওয়া এসব সমস্যাজনিত চাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিবেচনাশক্তি কমিয়ে দেয়। একজন মানুষের জীবনে যত বেশি অসমাধিত সমস্যা থাকবে, তার মস্তিষ্কের বিচার–বিবেচনা করার ক্ষমতা তত কম হবে।

বর্তমান সমাজে জনবিস্ফোরণের ফলে মানুষের অবস্থা কলহনের পরীক্ষাগারের ইঁদুরের মতো হয়ে আছে, অন্যদিকে প্রত্যেকেই নানান সমস্যায় জর্জরিত। অর্থাৎ প্রায় সবাই চাপ সহ্য করার চরমসীমার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। ওপর থেকে একটা লোককে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে তাঁর সহ্যশক্তি হয়তো বা শেষ পর্যায়ে। আপাত সাধারণ কোনো অপছন্দের ঘটনাতেই তাঁর মানসিকতা 'স্ফুটনাঙ্ক' অতিক্রম করে যেতে পারে। আবেগের বশে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি হয়তো প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, প্রত্যক্ষভাবে কোনো ঘটনায় জড়িয়ে পড়বেন। ভালো কি মন্দ, পরে কী হবে এসব কথা ভাবার ক্ষমতা সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একই রকম মানসিক অবস্থার লোক একসঙ্গে আবেগতাড়িত হয়ে যখন কোনো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে অথবা কোনো অঘটন ঘটায়, তখনই গণউন্মত্ততা বা গণঅসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে, এর কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকে না। যে কোনো একটা 'ইস্যু' নিয়ে এটা শুরু হতে পারে। একবার যদি গণউন্মত্ততা শুরু হয়, তা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কতটা প্রাণঘাতী কিংবা সম্পদহানি হবে, জনজীবন কতটা বিঘ্নিত হবে, কেউ বলতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, এর কোনো প্রতিবিধানও নেই। আগে থেকে অনুমতি নেওয়া সভা–সমাবেশ, অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুযায়ী প্রশাসন কিছু ব্যবস্থা নেয়। সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক দলের অতীত কর্মকাণ্ড, লোকবল, বর্তমান 'ইস্যু'টার গুরুত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে পুলিশ ফোর্স, কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ইত্যাদি নিয়ে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে তৈরি থাকে। কিন্তু চোর–বাটপার ছেলেধরা, আগুন ইত্যাদির মতো ছোটো থেকে আচমকা বড়ো হয়ে যাওয়া ঘটনা আগে থেকে অনুমান করা যায় না। প্রশাসন তখন লাঠি চালিয়ে, শূন্যে গুলি চালিয়ে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে, ভয় দেখিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে অকুস্থল ভীড়মুক্ত করার চেষ্টা করে। যাতে ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কম হয়। তবুও সবসময় শেষরক্ষা হয় না। অফিস, দোকানপাট, যানবাহন ভাঙচুর হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

কিন্তু এর জন্য কাকে দায়ী করা যায়? ঘটনার সূত্রপাত বলে যদিও একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু সেসব বেশিরভাগই হয় মীমাংসাযোগ্য অথবা পুলিশ প্রশাসনের বিষয়। এই অবস্থায় কোনো অপকর্মের যদি সুমীমাংসা হয়ে যায় কিংবা পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়, তবে তো এত কিছু হয়ই না। উল্টে যে যার চরিত্র এবং মানসিক চাপ নিয়ে ঘটনাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। উদ্বেগের বিষয়, এই ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের সবসময় যেন তটস্থ অবস্থা। একদিকে শান্তিরক্ষার দায়, অন্য দিকে ব্যর্থ হলে পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করার দায়। উভয়সঙ্কটের মাঝে কাজ করতে করতে পুলিশকর্মীরাই আজকাল ভীষণ চাপের মধ্যে থাকেন। সবসময় অবশ্য গনণষ দানা বাঁধতে পারে না। ঠাণ্ডা মাথার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এখনও অনেক আছে বলেই অনেক ঘটনা শুরুতেই মীমাংসিত অথবা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে স্তিমিত হয়ে পড়ে। গণ–উন্মত্ততা বীভৎস রূপ ধারণ করতে পারে না। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

সূত্র: ১. 'Body Language', by Allan Pease. ২. The rodent experiment by John B. Calhan, অন্তর্জাল থেকে।

৩. The Psychology of Patience, by M. Farouk Radwan.

উমা

জরায়ুহীন যন্ত্রের অন্তহীন সারি

ভবানীপ্রসাদ সাহু

মৌমাছির জগতে শ্রমিক মৌমাছিরা আসলে বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি। রানী ও পুরুষ মৌমাছি থাকে একটি করে। এদের কাজ শুধু প্রজনন। আজ কোনো কাজ নেই। এদের ঘিরে থাকে অসংখ্য শ্রমিক মৌমাছি, যারা স্ত্রী মৌমাছি হয়েও 'গর্ভধারণ' অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম দিতে পারে না। যন্ত্রের মতো শুধু কাজই করে যায়। ফুল থেকে মধু সংগ্রহ, মৌচাক বানানো, সবার খাবার জোগাড় করা— সব কিছু। প্রাকৃতিকভাবে মৌমাছির ক্ষেত্রে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাণীজগতে এমনটি নেই বললেই চলে, মানুষের ক্ষেত্রে তো নয়ই। নারীপুরুষ— উভয়ের শরীরই সন্তানসন্ততির জন্ম দেওয়ার কাজটি যৌথভাবে করার উপযুক্তভাবেই প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। তবে নারীর শরীর যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে গর্ভধারণ করার পর শরীর থেকেই সন্তানের জন্ম দেয়, তাই তার মধ্যে থাকে নারীত্বের ঐ বিশেষ অঙ্গ— গর্ভ বা জরায়ু (ইউটেরাস, গ্রিক প্রতিশব্দ হিস্টেরস)। নারীত্বের পরিচয় যেমন এই জরায়ু, তেমনি নারীশরীরের স্বাভাবিক একটি অঙ্গও এটি।

কিন্তু যদি জানা যায় যে, মহিলাদের ঐ শ্রমিক মৌমাছি তথা বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছির মতো, যান্ত্রিকভাবে কাজ করানোর জন্য বা তাদের কাজের যন্ত্রে পরিণত করার জন্য, হাজার হাজার মহিলার জরায়ু সচেতনভাবে কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও এবং মনের মধ্যে যতই বিস্মিত যন্ত্রণার সৃষ্টি হোক না কেন, এটি ঘটছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও কিনা জানা নেই, তবে এই 'অচ্ছে দিন'-এর আধুনিক ভারতে। মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে খরা-অধ্যুষিত 'বিদ' জালার হাজিজুর গ্রামে। নিজের কুঁড়েঘরে বসে মান্দা উগালে নামের এক মহিলা যেমন অনেক বেদনা নিয়ে বলেছেন, 'আমাদের এই এলাকায় গর্ভ (অর্থাৎ জরায়ু) শরীরে আছে এমন মহিলার দেখা প্রায় পাবে না! এই সব গ্রাম হচ্ছে গর্ভহীন মহিলার গ্রাম।' চোখে তাঁর শূন্য দৃষ্টি।

আসলে এই সব এলাকা থেকে আখ কাটার মরশুমে লক্ষ লক্ষ মহিলা ও পুরুষ মহারাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে পাড়ি দেয়। সময়টা অক্টোবর থেকে মার্চ। পুরুষদের নিয়ে ঝামেলা নেই। কিন্তু মহিলাদের নিয়ে সমস্যা হচ্ছে মাসের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তিন-চার দিন ঐ অতি পরিশ্রমসাধ্য কাজ তাঁরা করতে পারেন না, ছুটি নিতে হয়। তাই যে সব দালাল বা কন্ট্রাক্টররা আখজমির মালিকদের শ্রমিক সরবরাহ করে, তারা এই মহিলাদের কাজে নিতে চায় না। তাই ঐ এলাকায় অতিদরিদ্র ঐ সব মহিলার দু-তিনটি বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর জরায়ু বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে কাজ করে। এক টন আখ কাটলে তারা পায় প্রায় ২৫০ টাকা, সারা দিনে কাটে ৩-৪ টন। আর চার-পাঁচ মাসের মরশুমে প্রায় ৩০০ টন। এটিই তাদের সম্বৎসরের আয়— সন্তানসন্ততির মুখে দু বেলা খাবার দেওয়ার এবং নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার রসদ। খরার কারণে চাষবাস প্রায় নেই। অন্য কোনো উপার্জনের উপায়ও নেই, দারিদ্র্য দূরীকরণের হাজারো সরকারি ঢক্কানিনাদ যতই হোক না কেন, স্ত্রী যদি মাসিকের জন্য একদিনও ছুটি নেয়, তবে ঐ দালাল দিনপ্রতি ৫০০ টাকা কেটে নেয়। হ্যাঁ, তাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের উপার্জন তারা ঐ দালালের হাত দিয়েই পায়। ঐ হতদরিদ্র দম্পতির পক্ষে একদিনের জন্য ৫০০ টাকা না পাওয়াটা বিরাট আর্থিক ক্ষতি। জরায়ু বাদ দিয়ে দিলে সব ঝামেলা মিটে গেল। জরায়ু বাদ দেওয়ার এই অস্ত্রোপচারের (হিস্টেরেক্টমি) জন্য দালালরা অগ্রিম টাকা দেয়। মাইনে থেকে ঐ টাকা কাটা যায়। এইভাবেই জরায়ু বাদ দেওয়ার ব্যাপারটাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পেটের দায়ে ঐ মহিলারাও স্বেচ্ছায় এই অস্ত্রোপচার করার ঝুঁকি নিচ্ছে।

বিয়ের বয়সের ব্যাপারে সরকারিভাবে যাই-ই ঘোষণা থাকুক না কেন, মারাঠাওয়াড়ার ঐ সব এলাকায় গ্রামের দরিদ্র অবিবাহিত মেয়েদের ১৫-১৬ বছর বয়সেই বিয়ে হওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার। তাই ২০-২২ বছর বয়স হতে না হতেই দু-তিনটি সন্তানের মা হয়ে যায় তারা। তারপর শুরু হয় চক্রাকারে দারিদ্র্য, অনাহার। আর এ থেকে মুক্তি পেতে দালালের হাত ধরে স্বামীর সঙ্গে চলে আখকাটার জন্য। তার জন্য মহিলাদের আগে জরায়ুটি বাদ দিতে হয়, যাতে কোনো ছুটি না নিয়ে জীবন্ত এক যন্ত্রের মতো তারা কাজ করে যেতে পারে। তবে অনেক মহিলাই স্বেচ্ছায় শুধু আখকাটার কাজের মধ্যে মাসিকের ছুটি না পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের গর্ভটিকে শরীর থেকে বাদ

দেওয়ার ব্যাপারটা ভাবে না। তাই এলাকায় গর্ভ বাদ দেওয়ার ব্যাপারটাকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য চিকিৎসাগত মিথ্যাচার করা হয়। অর্থোপার্জনের জন্য এক শ্রেণীর চিকিৎসকও তাতে সামিল হয়। মেয়েদের মধ্যে এমন প্রচার করা হয় যে, দু-তিনটি বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর একটু সাদাস্রাব বা 'বেশি' রক্তক্ষরণ, সাধারণ পেটে ব্যথা মানেই ক্যান্সারের পূর্বলক্ষণ, আর জরায়ু বাদ দেওয়াটাই তার চিকিৎসা। তাছাড়া এটি আর সন্তান না আসার নিশ্চয়তাও দেয় অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনার একটি সুনিশ্চিত উপায়। সব মিলিয়ে মেয়েরা অস্ত্রোপচারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়।

স্বামী-দালাল-চিকিৎসক— সবাই মিলে মেয়েটিকে বা বলা ভালো তার জরায়ুটিকে অভিমন্যুর মতো ঘিরে ফেলে তারপর হত্যা করে। তার কিছুদিন পরেই সে চলে আসে আখকাটার বিরামহীন কাজে। স্বামী চায় জরায়ুহীন স্ত্রী বিনা ছুটিতে যাতে বেশি অর্থোপার্জন করতে পারে, সঙ্গে থাকে বিপদমুক্ত যৌনসম্পর্ক। দালাল তাকিয়ে থাকে কত বেশি ঝামেলামুক্ত শ্রমিক চালান দিয়ে কত বেশি অর্থোপার্জন করা যায়। চিকিৎসক চায় চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত ভাবে জরায়ু বাদ দেওয়ার প্রকৃত কারণ না থাকলেও ঐ অস্ত্রোপচার করে কত বেশি টাকা জমানো যায়। পুরুষতান্ত্রিকতার এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় মহিলারা।

আখকাটার কাজে বাড়ি থেকে বহুদূরে অচেনা বন্ধুহীন ঐ পরিবেশে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। স্যানিটারি ন্যাপকিন তো তারা এমনিতেই ব্যবহার করতে পায় না। কিন্তু ঐ জায়গায় পরিষ্কার কাপড়ও দুর্লভ। জলের সমস্যাও প্রকট। তাই বিদেশ বিভুঁইতে কয়েক মাসের কাজে, মাসে মাসে মাসিক হওয়াটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এটিও জরায়ু বাদ দেওয়ার সুবিধা হিসেবে দেখে তারা। তারপর শুরু হয় কাজ। দিনের পর দিন টন টন আখ কাটা শুধু নয়, ঐ মহিলারা এক এক বারে ৩০-৪০ কিলোগ্রাম আখ মাথায় বয়ে নিয়ে যায় এবং ট্রাকভর্তি করে। মধ্যে মাসিক ঋতুচক্রের নারীর স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি যাতে অসুবিধার সৃষ্টি না করে, তার জন্য তার শরীরটিকেই অস্বাভাবিক, অঙ্গহীন করে দেওয়া হয়। কিন্তু এসবের পেছনে প্রধান ভূমিকাটা পালন করে দারিদ্র্য, দুঃসহ অভাব।

মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলটি আটটি জেলার সমাহার — ঔরঙ্গাবাদ, জালনা, পারভানি, হিঙ্গোলি, বিদ, নানদেদ, ওসমানাবাদ ও লাটুর। এমনিতেই এলাকাটি খরাপ্রবণ, জলের কষ্ট চিরস্থায়ী। ক্রমশ যেন তা বাড়ছেই। এই এলাকার মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগই গ্রামের। প্রধান কৃষি হচ্ছে ভুট্টা, সয়া, তুলো, মোসাম্বি, ডাল, বাদাম। কিন্তু জলের অভাবে ফসল পাওয়া যায় খুবই কম, হাজার হাজার মোসাম্বির বাগান শুকিয়ে গেছে। ফলশ্রুতি কৃষকের আত্মহত্যা। গত পাঁচ বছরে এই এলাকায় ৪৬৯৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন বলে নথিভুক্ত হয়েছে। মৃত্যু ঘটে অন্যভাবেও। নানদেদ জেলার ১৩ বছরের সারিকা আর তার কয়েকজন বন্ধু প্রখর রোদে কয়েক মাইল হেঁটে বাড়ির জন্য পানীয় জলের খোঁজে বেরিয়েছিল। অবশেষে একটি কুয়োর তলায় একটু জল দেখতে পায়। জল ভরার জন্য নামতে গিয়ে সারিকা টাল সামলাতে পারে নি, পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটে বালিকাটির। এমন উদাহরণ আরো আছে। সরকারিভাবে পানীয় জলের জন্য ট্যাঙ্কারে জল পাঠানো হয়। এপ্রিলের ৪ তারিখে (২০১৯) তার সংখ্যা ছিল ২০৬৩ এবং ২০৯২টি গ্রাম ও মহল্লায় তা জল নিয়ে যায়। কিন্তু স্পষ্টতই প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য এবং ট্যাঙ্কারগুলি এত নোংরা ও জল এতই খারাপ যে গবাদি পশুরাও তা খেতে চায় না বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ। আর চাষের জন্য জলের ব্যবস্থা তো আরো খারাপ।

নদীতে জল নেই, বাঁধ শুকনো, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনেক নীচে। এই অবস্থায় প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ দরিদ্র কৃষক ও কৃষিশ্রমিক চাষের কাজ যতটুকু হয় করার পর চলে যায় আখকাটার কাজে, যার অর্ধেক না হোক অন্তত ৫-৬ লক্ষ মহিলা, যাদের প্রায় সবাই-ই জরায়ুহীন। একমাত্র উদ্দেশ্য, মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ করা, যাতে বিনা ছুটিতে যন্ত্রের মতো কাজ করা যায়। দালাল, স্থানীয় চিকিৎসক এবং স্বামীরাও হয়তো, এই সব মহিলার মধ্যে এই স্বাভাবিক ঋতুস্রাবকে ঝামেলা হিসেবে গ্রহণ করার অর্থাৎ বাড়তি অর্থোপার্জনের বাধা হিসেবে মনে করার ব্যাপারটি ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু এইভাবে জরায়ু বাদ দিলে বিপদ কিছু ঘটে কি? সত্যি কথা বলতে, কই ভয়াবহ বিপদ কিছু ঘটে না বলেই, ব্যাপারটি গ্রহণীয় হয়েছে। দু-তিনটি সন্তান হয়ে যাওয়ার পর, সন্তানের চাহিদা যখন আর থাকে না, তখন জরায়ুর মুখ্য ভূমিকাটিও আর থাকে না। যেমন, আমাদের পেটে বৃহদন্ত্রের লেজুড় হিসেবে থাকা অ্যাপেন্ডিক্সটির কোনো কাজই নেই, তাই কোনো কারণে অস্ত্রোপচার করে পেট খোলার পর, অসুস্থ হোক বা না হোক অ্যাপেন্ডিক্সটিও কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো সম্ভাব্য ভয়াবহ অবস্থা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ অ্যাপেন্ডিক্সটি কেটে বাদ দেওয়ার জন্যই পেটে অস্ত্রোপচার

করাটা সাধারণভাবে গ্রহণীয় নয়, এমনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং সম্পূর্ণ অনৈতিক হচ্ছে সম্পূর্ণ সুস্থ জরায়ুটিকে শুধু মহিলাটিকে কাজের যন্ত্রে পরিণত করার জন্য বাদ দেওয়া। এই অনৈতিক কাজটিই মারাঠাওয়াড়ার ঐ হাজার হাজার মহিলার মধ্যে করে চলেছে আখের ক্ষেতে মজুর সরবরাহ করার দালাল, এলাকার চিকিৎসকদের একাংশ এবং সঙ্গে মহিলাদের স্বামীরাও। সবাই নারীশরীরকে আরো অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। সীমাহীন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত বামীদের করুণ অবস্থাটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু বিশেষত যে চিকিৎসকেরা এই অনৈতিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানগত ভাবে অপরাধমূলক কাজ করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা হয় নি, হয়ও না।

অন্যদিকে, সুস্থ অ্যাপেন্ডিক্স বাদ দেওয়ার সঙ্গে সুস্থ জরায়ু বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি হুবহু এক করা যায় না। প্রথমটির প্রতিক্রিয়ায় কিছুই অসুবিধা হয় না। কিন্তু জরায়ু বাদ দেওয়ার পরবর্তী সময়ে অনেক মহিলাদের মধ্যে হরমোনঘটিত নানা অসুস্থতা, মুটিয়ে যাওয়া তথা স্থূলতা ও তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিপদগুলি এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট মহিলার মানসিক আঘাতজনিত নানা লক্ষণ দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে জরায়ুর সঙ্গে ডিম্বাশয় (ওভারি) দুটিও বাদ দেওয়া হয় বলে দেখা গেছে। সে ক্ষেত্রে এ বিপদগুলি আরো বাড়ে।

'দ্য হিন্দু' পত্রিকার 'বিজনেস লাইন'-এ ৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের একটি প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনের পর জাতীয় মহিলা কমিশনের (ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন, এনসিডব্লু) পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়, মহারাষ্ট্র সরকারের মুখ্য সচিবকে একটি নোটিস পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, নিছক কাজের জায়গায় কামাই ও কামাই করলে ফাইন দেওয়া বন্ধ করার জন্য অসংখ্য মহিলার জরায়ু বাদ দেওয়ার মতো অনৈতিক, অপরাধমূলক কাজ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। কী পদক্ষেপ নেওয়া হল এবং এইসব মহিলাদের পুনর্বাসনের কী ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেগুলি 'এনসিডব্লু'-কে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপ অবশ্যই কাম্য। যে কোনো মানবিক ব্যক্তিই চাইবেন না নারীকে নিছক কাজের জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এমন অনৈতিকভাবে কোনো শারীরিক প্রয়োজন ছাড়া এমন অঙ্গহানি করা হোক। কিন্তু পাশাপাশি আরো দু-একটি কথা উঠে আসে। নারীর স্বাভাবিক মাসিক ঋতুস্রাবকে ঘিরে কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অপমানজনক ধ্যানধারণা এখনো ব্যাপকভাবে রয়েছে। ঋতুকালে যে রক্ত বেরোয় তা স্বাভাবিক রক্তই, জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণীর সূক্ষ্ম রক্তবহা নালিকা ফেটে গিয়ে তা বেরোয়। চার সপ্তাহের সমগ্র ঋতুচক্রে দুটি ডিম্বাশয় থেকে সাধারণত একটি ডিম্বকোষ (ওভাম) বেরোয়। এটি পুরুষের শুক্রকোষ দিয়ে নিষিক্ত না হলে, ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে রক্তবহানালিকা ঐভাবে ফেটে যায়। তাই এই রক্তে অতিরিক্ত থাকে একটি অনিষিক্ত ডিম্বকোষ। ডিম্বকোষটি নিষিক্ত হলে, ইস্ট্রোজেন হরমোন কমে গিয়ে প্রজেস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বেশি হয়। এর ফলে গর্ভাধান (প্রেগন্যান্সি) শুরু হয়, ঐ রক্তবহানালিকা আর ফাটে না, ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। স্পষ্টত এই রক্ত মলমূত্রের মতো বর্জ্য পদার্থ নয়, জীবাণুমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন। তাই এই রক্তস্রাবের জন্য মাসিকের সময় নারী শরীর অশুচি অপবিত্র হয়ে যায় বলে অনেকে যা ভাবেন, তা আসলে অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কারমাত্র।

অস্তিত্বহীন দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা পূজাআচ্চার মতো, প্রকৃত অর্থে নিরর্থক তথাকথিত শুভ কাজে ঐ সময় মেয়েদের অংশগ্রহণ না করতে দেওয়াটাও একটি অমানবিক কুসংস্কার। কেরালার শবরীমালাই মন্দিরের ব্রহ্মচারী দেবতার চিত্তচাঞ্চল্য হওয়ার ভয়ে ১৫-৪৫ বছর বয়সী প্রজননক্ষম নারীর ঐ মন্দিরে ঢোকা নিষিদ্ধ করাটা তো আরো হাস্যকর। এবং আরো বেদনাদায়ক হচ্ছে ই-যুগের নারীও ঋতুকালে নিজেরা অশুচি অপবিত্র হয়ে যান বলে গভীর বিশ্বাস করে বসে আছেন। এই আত্মঅবমাননাকর বিশ্বাস থেকে অনেক নারীই ঐ সব 'শুভ' কাজে যান না এবং শবরীমালাই মন্দিরে ঢোকার সুপ্রিমকোর্টের ছাড়পত্র পেয়েও তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। এই দিকটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়ায় অর্থনৈতিক কারণে। মাসিক ঋতুস্রাবকে কাজের জন্য একটি বাধা হিসেবে ভাবার কুসংস্কার, অন্যদিকে অর্থোপার্জনের কাজে তাকে বাধা হিসেবে ভাবার বাস্তব কারণ। পেটের দায়ে মারাঠাওয়াড়ার মহিলারা যেমন হাজারে হাজারে নিজেদের জরায়ু বাদ দিচ্ছেন, তেমনি শবরিমালার অন্ধভক্তিমতী মহিলারা ওদের ব্যাপারটি জানতে পারলে হয়তো নিজেদের ঐভাবে জরায়ুমুক্ত করে ফেলবেন। ঋতুস্রাবও হবে না, শরীর 'অশুচি'ও হবে না। ঝামেলা মিটে গেল? আর এইভাবে ঝামেলা মিটিয়ে জরায়ুমুক্ত হওয়াটাকে নারীমুক্তি ও যৌনমুক্তির একটি উপায় হিসেবে গণ্য করতে পারেন কেউ কেউ। কিন্তু এইভাবে জরায়ু কেটে ফেললেই নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সবশেষে এটিও অনুভব করা দরকার যে, মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়ায় সহস্র সহস্র মহিলারা যেভাবে জরায়ু বাদ

দিচ্ছেন, তার মূল কারণ দারিদ্র্য। যে কারণে আমাদের দেশে শিশুশ্রমিক আইনত বন্ধ করা হলেও, আদৌ তা বন্ধ হয় নি। আঠারো বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ হলেও, তাও হয় নি। জাতীয় মহিলা কমিশনের চাপে মহারাষ্ট্র সরকার ঐভাবে অনৈতিক ও বেআইনি জরায়ু বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচার বন্ধ করলেও, যে কারণে তা ঘটে চলেছে, তার সমাধান না হলে ঐ মহিলাদের প্রকৃত কোনো উপকার হবে না। একদিকে সীমাহীন সম্পদের মালিক মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী ও নেতা, অন্যদিকে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ। কোনো বিলাসিতার জন্য নয়, নিছক বাড়ির সবার মুখে পেট ভরা দু মুঠো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য এই কোটি কোটি মানুষদের মধ্যে কেউ বাধ্য হবেন নিজের

শিশু পুত্রকন্যাকে দিয়ে অর্থোপার্জন করাতে, নিজের শিশুকন্যাকে বিক্রি করে দিতে বা শিশুকন্যার বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে, অনিচ্ছুক দেহকে ভোগের জন্য বিক্রি করতে, অথবা নিজের জরায়ু বাদ দিয়ে যন্ত্রের মতো নিরন্তর কাজ করে যেতে।

তথ্যসূত্র: বিজনেস লাইন, দ্য হিন্দু, ৯ ও ১১ এপ্রিল ২০১৯

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার **ফোন নম্বর**: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ -১২৬৩৭।

জলসঙ্কট

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

নীতি আয়োগ এ দেশের নীতিগ্রহণের শীর্ষ সংস্থা। তার রিপোর্টে প্রকাশ, আগামী গ্রীষ্মে এ দেশের ২১টা শহরের ভূগর্ভস্থ জল শুকিয়ে যাবে। জলের এমন সঙ্কটের ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা টের পাওয়া গিয়েছে এবারের গ্রীষ্মেই। চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, মুম্বই— প্রতিটি শহরেই। নীতি আয়োগের মতে, এখন থেকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা না নিলে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে চাহিদার তুলনায় জলের জোগান কমে যাবে, ফলে শুধু শহর নয় গোটা দেশ জুড়েই তৈরি হবে জলসঙ্কটের ভয়াবহ চেহারা।

বর্তমান জলসঙ্কটের কারণ বহুমাত্রিক। পৃথিবী জুড়েই জলবায়ু পরিবর্তনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থলভাগে কমছে। বৃষ্টির যে জল জমিতে পড়ে তার একাংশ মাটির ভেতরে চুঁইয়ে ঢোকে আরেক অংশ নদীনালা বেয়ে সমুদ্রে পড়ে। সেই জল দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগে না। তাই ব্যবহারযোগ্য জলের সঞ্চয় বাড়াতে হলে নদীবাহিত মিষ্টি জলের সঞ্চয় বাড়াতে হবে আবার অন্যদিকে বৃষ্টির জলকে যথাসম্ভব বেশি মাত্রায় মাটির ভিতরে যাওয়ার রাস্তা করে দিতে হবে।

এই দুটি বিষয়ের ওপরই মূলত নির্ভর করবে আগামীর জলসঙ্কট সমাধানের পথ। জলসঙ্কটের একটা বড়ো কারণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা। এই মুহূর্তে আমাদের দেশে ১৩৫ কোটি মানুষের বাস। যাদের গড় আয়ু প্রায় ২৭ বছর। এই বিপুল তারুণ্যে ভরা দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছে বর্ধিত জলের প্রাত্যহিক চাহিদা। এই জনসংখ্যার একটা বড় অংশ থাকে শহর–শহরতলিতে, যেখানে মোট ভূপৃষ্ঠের এলাকার তুলনায় বাড়িঘর ও মানুষের ঘনত্ব অনেকটাই বেশি। ফলে জলের স্বাভাবিক চাহিদা গ্রামের তুলনায় বাড়ছে শহরে হু–হু করে। জলের চাহিদা মেটাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে গভীর নলকূপ সরকারি নিয়ন্ত্রণের তোয়াক্কা না করেই। ধাক্কায় শহরের ভূপৃষ্ঠ ঢাকা পড়ছে কংক্রিটের চাদরে। কংক্রিট ভেদ করে জলের পাতালপ্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবেই ভূপৃষ্ঠের জলস্তরে জলের জোগান কমে চলেছে অথচ তৈরি হচ্ছে বাড়তি চাহিদা।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশিত যে, হায়দ্রাবাদ ও চেন্নাই শহরে প্রতি বছর ভূপৃষ্ঠ দিয়ে যত বৃষ্টির জল ঢোকে যথাক্রমে তার চারগুণ ও আড়াই গুণ জল টেনে পাম্প করে বের করে নেওয়া হয়। কলকাতা পুরসভার রিপোর্টেও প্রকাশ বর্তমানে এ

শহরের জলস্তর নামতে নামতে ভূপৃষ্ঠের এগারো মিটার নীচে পৌঁছেছে। এই জলস্তর নামায় মাটির স্তরও বসতে শুরু করেছে। যার প্রভাব ভবিষ্যতে পড়বে শহরে বাড়ি সেতুর ভিতের স্থায়িত্বেও। ফলে এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভাগুলিকে নতুন বাড়ির নকশা অনুমোদনের আগে এলাকাভিত্তিক জলের চাহিদা ও জোগানের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এমনকি জলসম্পদ ও কারিগরি জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে নতুন করে তৈরি হওয়া জেলা–শহরগুলিতে পরিস্রুত নদীর জল সরবরাহের পরিকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষত রাজ্যের খরাপ্রবণ পশ্চিমের জেলাগুলিতে।

সম্প্রতি ক্রিকেটার বিরাট কোহলি অভিযুক্ত হয়েছিলেন গুরুগ্রামের প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকা ছটি বিদেশি গাড়ি প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল দিয়ে পরিষ্কারের অপরাধে। প্রতিবেশীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গুরুগ্রাম পুরসভা মাত্র ৫০০ টাকা জরিমানা করেছিল। যেখানে তাঁর বাড়িতে ফ্রান্স থেকে আনা এভিয়ান কোম্পানির এক লিটার জলের দাম পড়ে ৬০০ টাকা। শিল্পক্ষেত্রেও যথেচ্ছ জল অপচয় হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা লাভের জন্য একেকটা অঞ্চলকে জলশূন্য করে তুলছে কোকাকোলার মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলি। কোকাকোলা ৫৮টি প্ল্যান্টে দৈনিক পাঁচ লক্ষ লিটার জল বিনা পয়সায় ব্যবহার করে। সারা বছর তাদের মাটির নীচ থেকে তোলা জলের পরিমাণ ১০৫৮ কোটি লিটার। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে একা কোকাকোলা যে পরিমাণ জল কুড়ি বছরে মাটি থেকে তুলেছে, তাতে গোটা দেশের মানুষের এক বছরের জলের জোগান নিশ্চিত করা যায়। সর্বোপরি এই সংস্থা বর্জ্য পদার্থ ফেলে ভূগর্ভস্থ জলকেও দূষিত করে তুলছে। উল্লেখ্য, মাটির নীচ থেকে তোলা জলের মাত্র ৮% ব্যবহৃত হয় পানীয় জল হিসেবে, বাকিটা কীভাবে কোথায় খরচ হচ্ছে তার অবিলম্বে খতিয়ান তৈরির প্রয়োজন ভবিষ্যতকে নিরাপদ করার স্বার্থেই। নিরাপদ জল ব্যবহারের জন্য এখন টিভি জুড়ে বাহারি ফিলটারের বিজ্ঞাপন আর ও ফিলটার ও পিউরিফায়ার। কিন্তু বাস্তবে অশোধিত জলের ৭৪% অপচয় করে মাত্র ২৬% জলকে শুদ্ধ করে ঐ পিউরিফায়ার। বাকিটা জল পরিস্রবনের সময় নালা বেয়ে বয়ে যায়। প্রতিদিন বাথরুমের ফ্লাস ও কমোডও অপচয়কে ত্বরান্বিত করছে। ফলে এখন থেকেই ঘর গেরস্থালির প্রয়োজনে জল সাশ্রয়ী ওয়াটার ফিল্টার, বাথরুম ফিটিংসের ওপর সরকারি বিধিনিষেধ চালু করা উচিত, যেমনটি চালু হয়েছে দূষণহীন গাড়ির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের বিধিনিষেধ। পাশাপাশি একথাও ভাবতে হবে যে জলের উৎস থেকে গেরস্থের বাড়ি অবধি জল পৌঁছানোর পাইপ লাইন বরাবর জলের অপচয়ের প্রশ্নটিকেও। দেশের সর্বশেষ জনগণনা রিপোর্টে প্রকাশিত, মাত্র ৪৭% পরিবার কলের জল পাওয়ার অধিকারী। এক অর্থে কলের জল ন্যূনতম পরিশ্রুত ও সুরক্ষিত জল যা শহরের পৌরসভাগুলি সরবরাহ করে। এদেশে ফি-বছর দু লক্ষের মতো মানুষ মারা যায় শুধু দূষিত জলের প্রভাবে। পাইপ লাইন ফুটো হয়ে ঐ পরিস্রুত পানীয় জল শহরের বাড়ি অবধি পৌঁছানোর আগে মাঝপথেই নষ্ট হয়ে যায় ৪০%। এই পরিবহন অপচয় বন্ধ করতেই হবে। জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। জল অপচয় বন্ধের পাশাপাশি নিতে হবে জলসংরক্ষণের সামাজিক উদ্যোগ ও সরকারি প্রয়াস। শহর শহরতলিতে জলাশয় বুজিয়ে নির্মাণের ঝোঁক বেড়ে চলেছে। মনে রাখা উচিত যে জলাভূমিই বৃষ্টির জলের পাতাল প্রবেশের সিংহদুয়ার, ফলে জল সংরক্ষণের লক্ষ্যেই আজ প্রয়োজন জলাভূমির সংরক্ষণ ও সংস্কার। কোনো অবস্থাতেই জলাজমির আংশিক বা পূর্ণ ভরাট করা যাবে না। সৌন্দর্যায়নের নামে জলাভূমি বা পুকুরের পাড় কংক্রিট দিয়ে বা ইটের দেওয়াল তুলে বাঁধানো যাবে না। নিতান্ত প্রয়োজন হলে বাঁশ দিয়ে পাড় বাঁধানো যেতে পারে। জলের সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি ক্ষেত্রেও মরশুম অনুযায়ী বিশেষ সেচ ভাবনা প্রয়োজন। এমন কি জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে সেচ পদ্ধতিরও পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন, চাষের ধরন ও জলবায়ুর চরিত্রের সাথে সাযুজ্য রেখেই। এসবের পাশাপাশি বৃষ্টির জল সংরক্ষণের বাধ্যতামূলক সরকারি বিধি অবিলম্বে দেশ জুড়ে চালু করতে হবে সমস্ত নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে।

জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে নদীর জল বা বাঁধের জলও অন্যতম উপাদান। নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমতে থাকলে বৃষ্টির যে মিষ্টি জল নদী বয়ে নিয়ে যায় সেটির পরিমাণ কমে, ফলে পরিস্রুত পানীয় জলের বড় উৎস, নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমলে পরিশ্রুত পানীয় জলের পরিমাণও কমবে। কমবে জলের যোগান। পাশাপাশি নদীর ধারণ ক্ষমতা বাড়লে বিস্তীর্ণ নদীপথ বরাবর বৃষ্টির মিষ্টি জল সমুদ্রের নোনা জলে মেশার আগেই ভূপৃষ্ঠের নিচে জলস্তরে পৌঁছে যেতে পারে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারও সংরক্ষিত হতে পারে।

আজকের জলসঙ্কটের এই বহুমাত্রিক কারণ খুঁজে বের করা ও তার প্রতিকারের সন্ধানে পথ চলাই হচ্ছে এখন সময়ের ডাক। প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি যৌথ সামাজিক উদ্যোগের প্রয়োজন। তাই এর সমাধানে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবিলম্বে প্রয়োজন কঠোর প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা।

উমা

চেন্নাই: জল ধরে সঙ্কট-শঙ্কা নিরসন

বরুণ ভট্টাচার্য

তীব্র জলসঙ্কট কাটিয়ে চেন্নাই কি তাহলে 'জল–রাজধানী' হতে চলেছে?

চেন্নাইতে সারা বছরে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১৪০ মিমি। তাও মাসখানেক আগে সেখানে টানা ১৭০ দিন ধরে তীব্র জলসঙ্কট সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এমনকি বিদেশি মিডিয়ায় তা নিয়ে কম হৈচৈ হয়নি। গত জুন মাসে হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও ইনস্টাগ্রামে তাঁর ভক্তদের কাছে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

চেন্নাই এখনও পর্যন্ত এই সঙ্কটের মোকাবিলা করে উঠতে পারেনি তা ঠিক। তা সত্ত্বেও ৪২৫ বর্গমাইল এলাকায় বিস্তৃত এই শহরের মোট জনসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশি মানুষের জন্য আশার কথা শোনালেন অত্যাবশক পরিষেবা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃষ্ণ মোহন। তাঁর বিশ্বাস, আগামী বছর পাঁচেকের ভেতর চেন্নাই জলসঙ্কট কী জিনিস, তা ভুলে যাবে। হঠাৎ কী এমন ঘটনা ঘটল যে, তিনি এতটা নিশ্চিত হতে পারলেন? কী হচ্ছে সেখানে ? শ খানেক জলাশয়/ পুকুর/ জলাভূমি— যেগুলো কিনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এতে সামিল হয়েছেন শহরের আম নাগরিক। উদ্যোগটা নিয়েছে শহরের পুরপ্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক জলসঙ্কটের মোকাবিলায় এই কাজে মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা কিন্ত নয়। মানুষ সাড়া দিয়েছেন শহরকে বন্যার বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে। কাজটা শুরু হয়েছিল সেই ২০15 সালে। সে সময় ঐ বৃষ্টিতে বাঁধ ভেঙে শহরে জল ঢুকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আধিকারিকেরা একটা নকশা তৈরি করেন। সেইমতো বৃহত্তর পুর এলাকায় ২১০টি জলাশয় চিহ্নিত করা হয়। পরের ঘটনা বেশ অভিনব। পুরসভার ওয়েবসাইটে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়ে। জলাশয়গুলিকে বেশ গভীর করে খোঁড়া হয়। তাছাড়া ঠিকমতো জল আসার পথ থেকে পাঁক, জঞ্জাল, স্থায়ী নির্মাণ সব সরিয়ে দিয়ে ধারগুলো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে চারধারে গাছ লাগিয়ে পুরো ভোল পাল্টে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই পরিকল্পনামাফিক কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আর ক'মাসের ভেতর ২১০টি জলাধার সংস্কার করে ফেলা যাবে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছেন। এর ফলে জলাধারগুলি যে পরিমাণ জল ধারণ করতে পারবে তাতে চেন্নাইয়ের নাগরিকদের মাসখানেকের জলের প্রয়োজন মিটবে। মাটিতে জল যাওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় অনেকটাই বেড়ে যাবে। ২১৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করে ২১০টি জলাশয় সংস্কার করার পরিকল্পনা তো হল। এছাড়াও চেন্নাইতে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে ৬৩টি মন্দির রয়েছে সেগুলোতে পুকুরও আছে। তার থেকে ১৭টিতে মন্দির পরিচালন সমিতি কিংবা নাগরিক সমিতি মন্দিরের পুকুরের ভেতরে বেশ গভীর করে কুয়ো কেটেছে, যাতে করে রাস্তা জলমগ্ন হলে বাড়তি জল সরাসরি সেগুলোতে পড়তে পারে। কর্পোরেট সংস্থাগুলো যার যার কারখানা / দপ্তর সংলগ্ন জায়গায় বড় বড় জলাশয় তৈরি করছে, যা তাদের সামাজিক দায়িত্বপালন কর্মসূচির (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) ভেতর পড়ে। সেমবক্কম লেক, যার আয়তন ১০০ একর আর জলধারণের ক্ষমতা ১০০ কোটি কিউবিক ফুট, তা থেকে প্রায় ১০ হাজার টন জঞ্জাল ও পলি তোলার কাজ জোরকদমে চলছে। শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রায় ৩৬০০ জলাশয় রয়েছে, সেগুলোকে পরিকল্পনামাফিক সংস্কার করে এবং একটিকে অপরটির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিশাল জলাধার করার কাজও শুরু হয়েছে। মোট ৮ হাজার জলাধার থাকলেও তার সংখ্যা ১৫ হাজার করার চেষ্টা চলেছে লক্ষ্যমাত্রা ৫০ হাজার।

অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। বর্তমানে এ রকম দুটি প্ল্যান্ট রয়েছে। আরও দুটি হচ্ছে। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কৃষ্ণানদীর জল আসার ব্যবস্থাও জলের সঙ্কট মোকাবিলায় আরেকটি পদক্ষেপ।

সূত্র: বিজনেস লাইন, ২৮ আগস্ট ২০১৯

উমা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণ– হর্ষে ও বিষাদে

দেবীপ্রসাদ রায়

প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু নোবেল প্রাইজ পাননি। বলা ভাল, ওঁকে দেওয়া হয়নি। মরণোত্তর সম্মানটুকু দেওয়ার কথাও তো ভাবা যেত! বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীকে মরণোত্তর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, যখন দেখি, যে মৌলিক গবেষণার হাত ধরে আজকের কোয়ান্টাম কম্পিউটার চর্চার দুনিয়া–কাঁপানো অগ্রগতি, তা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'স্পিন' তত্ত্বনির্ভর ! তাহলে কি ধরে নিতে হবে, আইনস্টাইনের বিরাট আচ্ছাদনে আমাদের এই মহান ভেতো বাঙালি বিজ্ঞানী ঢাকা পড়ে গেলেন ! বর্তমান নিবন্ধে লেখকের সেই হতাশাই প্রকাশ পেয়েছে।– সম্পাদক

বিজ্ঞানে তাঁর অবদান নিয়ে বারবার চমৎকৃত হয়েছে গোটা বিশ্ব— সেই ১৯২৪-২৫ সালে বোস–আইনস্টাইন সংখ্যায়নিক সূত্র উদ্ভাবনের সময় থেকে শুরু করে ওই সূত্র ধরে বোস–আইনস্টাইন ঘনায়ন (কনডেনসেশন) ঘটনার বাস্তবায়নে (ক্যাভিটি) কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডিনামিক্স উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির সম্ভাবনার ব্রহ্মাণ্ড রহস্য উদ্ঘাটনে, হিগস–বোসন আবিষ্কারে এবং নতুন সম্ভাবনা সমূহের দ্বার উদ্ঘাটনে হিগস–বোসনের তাৎপর্যে— তাঁর জন্মের ১২৫ বছর পূর্তির স্মরণকালে বিষাদের কিছু থাকতে পারে কি?

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৮০তম জন্মবর্ষে ১৯৭৪–এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে জনৈক সাংবাদিক বসুর কাছে জানতে চান, তাঁর 'স্পিন' ধারণা আইনস্টাইন প্রাথমিকভাবে স্বীকার না করলেও তা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, তিনি কী বলেন? তাঁর উত্তর ছিল, 'well, after all if one has liked through so many years of struggle and if at the end his work has been appreciated, he feels that he does not need to live long'। ঘটনাচক্রে এর কয়েকদিন পরেই তিনি প্রয়াত যান। ঐ 'স্পিন' প্রশ্ন নিয়ে দৃশ্যত কোনো 'স্ট্রাগল'–এ তিনি যাননি, হৈচৈও করেননি, তবুও সদা–হাস্যমুখ নির্লিপ্ত গল্পগুজবপ্রিয় এই বিজ্ঞানীর মনে যে দীর্ঘদিন 'স্ট্রাগল' চলছিল, তা কি অস্বীকার করা যায়! তাঁর ঘনিষ্ঠরা, ছাত্র–বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে বসুর স্মৃতিচারণায় স্তুতিতে উদ্বেল হয়েছেন, কিন্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আলোচনাচক্রে, তাঁরা এই দিকটি তুলে আনেন নি কেন ? এ প্রশ্নে তাঁদের বিচলিত সাফাই— তিনি নিজেই এসবের ঊর্ধ্বে ছিলেন। বলেছিলেন, 'Every true scientist who engages in research not merely or the self-satisfaction or egotism dreams all the time that he might discover some fundamental principle that will help us to build a monument to human progress'। তাতেও কি অপ্রিয় প্রশ্ন তোলা থামে? ৭৩তম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে বসু বলেন, 'অনেকে অভিযোগ করে, বিজ্ঞানে আমি অনেক অবদান রাখতে পারতাম যদি না বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতাম। একমাত্র ভগবান জানেন এটা কেমন করে হল।'

ইউরোপ থেকে ফেরার কিছুকাল পরে তাঁর তৎকালীন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছিলেন ,'I was not really in science any more. I was like a comet, a comet which came once and never returned again.' এসব উক্তিতে কি স্পষ্ট নয় যে, তিনি অন্তরে এক হতাশাজনিত বেদনা বহন করছিলেন। এবার এর কারণগুলির পর্যালোচনায় আসা যাক।

আইনস্টাইন বসুর গবেষণাপত্রটিকে চমৎকৃত হয়ে তা গ্রহণ করলেন তবে সর্বাংশে সমর্থন করে নয়। তিনি একই প্লাঙ্কের শক্তিবণ্টন সূত্রটিতে এলেন, কিন্তু ভিন্ন ভাষ্য নিয়ে, কারণ বসু প্রস্তাবিত 'ফোটন স্পিন' ধারণাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি প্রয়োজনীয় '২' গুণাঙ্কটি পেলেন সমবর্তন গুণাঙ্কের সাহায্যে, যা সনাতন তত্ত্বনিরপেক্ষ ছিল না। অথচ ঘরোয়া আলোচনায় 'স্পিন'কে বাদ দিতে পারেননি বলে অনেকের মধ্যেই তা আলোচনা হত। অবশেষে নিলস বোর যখন ট্রেনে ১৯২৫ সালে লাইডেন লরেন্টেজের এক সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, তখন বিভিন্ন স্টেশনে হাইজেনবার্গ, পাউলি, এরেনফেস্ট ও আইনস্টাইন বোরের সঙ্গে দেখা করে স্পিন সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চান। বোর প্রথমে এই

ধারণাটিকে গ্রহণ না করলেও বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সূত্রে পরে 'স্পিন' ধারণার যুক্তিযুক্ততাকে স্বীকৃতি দেন। তারপর তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। জটিল রেখা বর্ণালির ব্যাখ্যায় তার সফল প্রয়োগ হল। এই ধারণার প্রবর্তক হিসেবে পাউলি, উলেনবেক গোডস্মিট ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এগিয়ে এলেন না সত্যেন্দ্রনাথ, যিনি এই ধারণার আসল প্রবর্তক। প্রচারের আলো না পেয়ে তিনি অন্তরালে চলে যান [Inward Beand-Abraham Paiz]

বসুর দ্বিতীয়পত্র: আব্রাহাম পেইজ তাঁর 'Subtle is the Lord' বইতে দাবি করেছেন, ডি ব্রগলি বসুর এক বছর আগেই নাকি 'গণনাটি' আইনস্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, তা ভুল, বরং আইস্টাইন ব্রগলির পাঠানো গবেষণাপত্রগুলিকে (কণাতরঙ্গ দ্বৈততত্ত্ব-সহ) যুক্তিসমৃদ্ধ নয় বলে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেননি। ইতিমধ্যে বসুর নতুন গণনা পদ্ধতি সমন্বিত গবেষণাপত্রটি এসে যাওয়ায়, তার ভিত্তিতে ব্রগলিকে বিচার করতে গিয়ে তাঁর প্রস্তাবনার যুক্তি পান। এর স্বীকৃতিতে ব্রগলি কণাতরঙ্গ দ্বৈততত্ত্বের জন্য নোবেল পুরস্কারও পান। শ্রোয়েডিংগার তাঁর বিখ্যাত তরঙ্গ-সমীকরণ গ্রন্থনার সময় এ ব্যাপারে জানতেন না। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্স বর্ন লিখলেন, 'The last of Einstein's investigations which I wished to discern in this report is work on the quantum theory of monatomic ideal gases. In this case, the original idea was not his but came from an Indian Physicist S.N.Bose.' [Einstein- Philosopher Scientist, Ed. by Paul Arthur Schialpp-Tudor Publishing Co., New York, 1951] সত্যেন বসুর ভূমিকা শ্রোয়েডিংগার জানতেই পারেন নি!

পেইজ তাঁর প্রাগুক্ত বইয়ে লিখেছেন, বসু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলেন লেগে গেছে। একই মন্তব্য করেন ম্যাক্স ডেলব্রুক 'was Bose-Einstein Statistics arrived at by serendipity?' বসুর ভুলক্রমে পেইজ-এর সিদ্ধান্ত মান্যতা পেয়ে গেল। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১০ মে, ১৯৯৮)।

আলোর শোষণ-নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি অঙ্গীকার (assumptions) নিয়ে আইনস্টাইন তাঁর সুপরিচিত এ, বি গুণাঙ্ক নিয়ে একটি তত্ত্ব খাড়া করেন। কিন্তু তাঁর সনাতন তত্ত্বনির্ভরতা ও অসম্পূর্ণতা বসুর নজর এড়ায়নি। তিনি আইনস্টাইনকে তাঁর কাছে পাঠানো দ্বিতীয় গবেষণাপত্র 'Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the presence of matter' প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'the problem of thermodynamic equilibrium of radiation in the presence of material particles can, however, be studied using the method of statistical mechanics independently of any special assumption about the mechanism of the elementary process on which the energy exchanges depend.' কতকগুলি প্রাথমিক শর্ত মানা হয়নি বলে বিকিরণ ও বস্তুর আন্তঃক্রিয়া নিয়ে বসুর বক্তব্য আইনস্টাইন মানতে পারেন নি। তিনি বসুকে জানান, সাক্ষাৎকারের সময় এগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। বসু তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটিকে প্রথমটির তুলনায় আরও মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে করতেন। প্রত্যয়ী বসু সাক্ষাৎকারের আগে আইনস্টাইনকে বোঝাবার একটা পটভূমি তৈরি করতে আর একটি চিঠি পাঠান, যাতে আইনস্টাইনের বক্তব্যকে খণ্ডন তো করেনই, উপরন্তু আইনস্টাইনের ব্যক্ত উদ্দেশ্য যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে সংখ্যায়নিক ভাষ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, তা নিয়েও প্রস্তাব রেখেছিলেন— 'I have tried to look at the radiation field from new stand-point and have sought to separate the propagation of quantum energy from the propagation of electromagnetic influence. I seem vaguely that such separation is necessary if quantum theory is to be brought in with Generalized Relativity Theory.' যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ও জার্নালে প্রকাশযোগ্য বলে ল্যাগিভাও (Langivein) তাঁর মন্তব্য জানালেও আইনস্টাইন তা প্রকাশ করতে দেননি। শুধু তাই নয়, সাক্ষাৎকারের সময় এ নিয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আইনস্টাইন বসুর সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে তাঁর প্রস্তাবিত একীকৃত তত্ত্বকে (Unified Field Theory) প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এতে হতাশ হন বসু। অথচ পরে ১৯৮৭ সালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে আইনস্টাইন তত্ত্বনির্ভর স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ (spontaneous emission) পরমাণুর কোনো স্বাভাবিক ধর্ম নয়।

আইনস্টাইন তত্ত্বাশ্রয়ী বলে মনে করা লেসার ও মেসার আবিষ্কার, ঘটনাচক্রে ভূয়োদর্শনজাত এক প্রাপ্তি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোনো মৌলিক নীতির কারণে নয়। এটাই বসু বলতে চেয়েছিলেন এবং যা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল আইনস্টাইনের প্রভাবেই। তাই বলা যায়, বসুর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেই পদার্থবিদ্যার নতুন এক শাখা ক্যাভিটি কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডিনামিক্স জন্ম নেয়, যার আধুনিকতম প্রাপ্তি

ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম কম্পিউটার। আমরা এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের বাস্তবায়নের কথা শুনছি। কিন্তু কোথাও সত্যেন বসুর নাম শুনছি কি?

এখন জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ কোনো এক পরমাণুর ধর্ম নয়, পরন্তু তা পরমাণুর শূন্যব্যবস্থার ধর্ম এবং উপযুক্ত পরিবেশে পরমাণু সন্নিবেশিত করে তাকে তাপপূর্ণ করে সঙ্কুচিত বা বর্জিত করা যায়। এই তত্ত্ব শূন্য মানে খালি বা সবকিছু বর্জিত অবস্থা নয়। পরন্তু তা প্রতীয়মান বা অপ্রতীয়মান পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াশীল আভাসী/ অলীক কণা (virtual particle) দ্বারা পূর্ণ। বসুর শূন্যগর্ভ তরঙ্গ ধারণা তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে অবশেষে আইনস্টাইন মেনে নেন।

সত্যেন বসুকে যথাযথভাবে মান্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের মানসিক সীমাবদ্ধতা তাঁর শেষদিন অবধি বজায় ছিল। গণিত ও পদার্থবিদ্যার যে কোনো সমস্যা তাঁর সামনে এলে বসু তার সমাধানে লেগে পড়তেন। মহাকর্ষ ক্ষেত্র ও তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র একীকরণ প্রচেষ্টার বিভিন্ন উপায় ভাবতে ভাবতে আইনস্টাইন ১৯৪০ সালে তাঁর প্রকাশিত বই 'Meaning of Relativity'-তে একটি সমাধান প্রয়াসে নির্ণায়ক সমীকরণ দেখালেন যার সংখ্যাতত্ত্বের সমাধান অত্যন্ত জটিল আকার নিয়েছিল। এতই জটিল যে বিশ্বখ্যাত গণিত ও পদার্থবিদ শ্রোয়েডিংগারকে বলতে হয়েছিল, '... it is next to impossible... this is hard to believe, unless one has tried'— [Proceedings of the Royal Irish Academy Vol.51 p166]

সত্যেন্দ্রনাথ এটা জানতে পেরেই ঐ তত্ত্বের সমাধানে উদ্যত হন। এক নতুন ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাধান করেন এবং তা প্রকাশ করেন। ১৯৫৫ সালে সমীকরণগুলির সমাধান করেন এবং সেগুলি আইনস্টাইনের কাছে পৌঁছলে তিনি এক চিঠিতে বসুকে জানান '...solution of those equation is not of great help toward the answer of the question: Do the singularity-free solution of the equation-systems have physical meaning? Are those at all singularity-free solutions which correspond to the atomistic character of matter and variation?' প্রশ্ন হচ্ছে একটা ভৌত (ফিজিক্যাল) সমস্যার সমাধান যখন পাওয়া গেল, তার ভৌত তাৎপর্য তিনি না পেলেও সমাধান তারও আছে। সে দ্বার তিনি রুদ্ধ করেন কী করে ? এবারে আর বসু চুপ করে থাকেননি। তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই আইনস্টাইনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বসু ঐ বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র-গবেষক-বিজ্ঞানীরা কোন আগ্রহ দেখালেন না কেন? এটা অবশ্যই আমাদের বিষাদগ্রস্ত করবে। তারপর নোবেল পুরস্কারের প্রসঙ্গ আমাদের বিষাদের কারণ হতেই পারে।

বসুর জীবৎকালে তাঁর অসাধারণ বৈভবমন্থিত কাজের মূল্যায়নে ব্যর্থ হলেন নোবেল কমিটি। আইনস্টাইন নিজেও নোবেল কমিটিতে ছিলেন। বসুর মৃত্যুর পরও তাঁর কাজের গভীরতা ও মৌলিকতা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মরণোত্তর নোবেল প্রাইজ তো ছিলই। বসু বাদ পড়েন কী করে! মরণোত্তর নোবেল প্রাইজ পান ১৯৩১ সালে এরিক এক্সেল সাহিত্যের জন্য, ১৯৬১-তে দ্যাগ হ্যামারশিল্ড পান শান্তির জন্যে। ১৯৭৪ সালে যখন তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র ও নিউক্লিয়ার ক্ষীণ বলক্ষেত্র একীকরণ প্রয়াসে বসু-ধারণাভিত্তিক বোসন কণা নিয়ে ব্যাপক কাজ চলছে, ঠিক সেই সময়ে মরণোত্তর নোবেল প্রাইজ বন্ধ করে দেওয়া হল! আর ঠিক তার পরেই ঐ কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পান আব্দুস সালাম-সহ আরো দুজন। বসুর জন্য ভাবনার দরজা বন্ধ হয়ে গেল! আবার শরীর ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য ২০১১-য় মরণোত্তর পুরস্কার পেলেন রাল্‌ফ এম স্টেবিম্যান। এগুলি উচ্চমানের মহান বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার মনে হলেও দেশবাসী বিষাদগ্রস্ত হতেই পারে। এই নিবন্ধের অবতারণা এজন্য যে, বাস্তবে এসব দৃষ্টান্তের কিছু ঘাত আছে সমাজে, কারণ এ বিষয়ে আগামী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য উপযুক্তভাবে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ই সি জি সুদর্শন তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করে গেছেন নিজের ক্ষেত্রে বঞ্চনার জন্য। সায়েন্স টুডে-র প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (১৯৮৮ এপ্রিল সংখ্যা)। এতসব মৌলিক অবদান সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের প্রচ্ছায়া/ উপচ্ছায়ার মধ্যে একরকম হারিয়েই গেলেন— বিষাদের এও এক কারণ। বসুর মৌলিক উপস্থাপনকে নিজস্ব ভাবনাচিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণেই যে অবদমিত করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন [আব্রাহাম পেইজ— সাটল ইজ দ্য লর্ড] 'I must seem like an Ostrich who forever buries its head in the relativistic sand in order not to fall the evil quantum.'- এ কথা ভাবাই যায়।

উমা

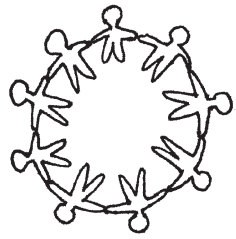

শ্রাদ্ধ নয়, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

জ্যোতিপ্রভা ভৌমিক ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর পরিবারের লোকেরা আর পাঁচজনের মতো ধুমধাম করে শ্রাদ্ধশান্তি এবং লোকজনকে ডেকে এনে চর্ব্য চোষ্য না খাইয়ে একেবারে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অন্যভাবে শোক জ্ঞাপন করলেন, স্মরণ করলেন। গত ১৯ মে, রবিবার, বিকেল পাঁচটায়, কল্যাণীর ঋত্বিক সদনের আলোচনাকক্ষে। শ্রাদ্ধের বদলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এই আয়োজনের উদ্যোক্তা জ্যোতিপ্রভা দেবীর কন্যা মিনু মজুমদার এবং ও পুত্র দিলীপ ভৌমিক। স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রয়াতা জ্যোতিপ্রভার স্মৃতির প্রতি সমবেত শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে স্মৃতিচারণ সভার কাজ শুরু হয়। সঞ্চালনা করেন ডাঃ আশিস মণ্ডল। প্রথমে স্মৃতিচারণ করেন পুত্র দিলীপ ভৌমিক। জানান, মা গত ২ মে, বৃহস্পতিবার বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াণের পর মায়েরই ইচ্ছানুসারে প্রথমে চোখ দুটি ব্যারাকপুর দিশা চক্ষু হাসপাতালের আই ব্যাঙ্কে দান করা হয়। এরপর মরদেহটি চিকিৎসক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য কল্যাণী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগে দান করা হয়। মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দিলীপ বলেন, মা ছিলেন স্নেহময়ী, নিষ্ঠাবতী, কুসংস্কারহীন, মুক্তমনা সাধারণ সংসারী এক গৃহবধূ। যিনি বলতেন, ‘কারো জন্য কিছু করার থাকলে তার জীবদ্দশাতেই করতে হয়। মৃত্যুর পর ঘটা করে লোকদেখানো কিছু করবি না।’ তাই এই স্মৃতিচারণসভার আয়োজন। ১৯৮৪ সালে বাবার মৃত্যুর পরও তিনি বড়জাগুলিস্থিত নিজ বাড়িতে আজকের মতো স্মৃতিচারণ সভা করেছিলেন। তখন মা আন্তরিকভাবেই আমার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও মা প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর এক সময়ে আমাদের দারুণ অর্থকষ্ট দেখা দেয়। সে সময়েও মা আমাদের সৎপথে বাঁচার আদর্শ শিখিয়ে গেছেন। এমন মায়ের জন্য আমরা গর্বিত।’ উপস্থিত সকলের আগমন ও সহযোগিতায় তিনি খুশি। সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করেন। এরপর অন্যান্য প্রিয়জনেরা স্মৃতিচারণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শুভময় বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম ধর, মনোরঞ্জন জানা, নিরঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস মজুমদার, বিমল বিশ্বাস, স্বপন শীল, অরিন্দম ভৌমিক, সাধন ঘোষ, শুকুর আলি মণ্ডল, ডাঃ সুশীল বিশ্বাস ও ডাঃ গিরিধর বিশ্বাস। কয়েকজনের স্মৃতিচারণে জানা যায়, তাঁরা তাঁদের পিতামাতার প্রয়াণের পর প্রচলিত আচার পালন না করে স্মৃতিচারণ সভা করে প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সকল স্মৃতিচারকগণই দিলীপবাবুর এই ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, জগৎ ও জীবন গতিশীল, তাই সমাজ এক জায়গায় বন্দী থাকতে পারে না। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আগামী দিনে এই ধরনের উদ্যোগে সকলেই সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেন। সঞ্চালক মহাশয় অনুষ্ঠানে আগত সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান।

প্রতিবেদক **সতীশচন্দ্র মণ্ডল**

কর্নিয়া সংগ্রহ

শিবপুর শ্মশানে গত ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে লাগাতার মরণোত্তর চক্ষুদান প্রচার চলেছে। রাত দেড়টা নাগাদ বাগনান থেকে অনুরোধ আসে এক মৃত ব্যক্তির চোখ সংগ্রহ করার। শিবপুর থেকে শিবির গুটিয়ে স্বদেশ আই ফাউন্ডেশনের কল্যাণ পাত্র কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে মাঝরাতে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাগনান পৌঁছন। সেখান থেকে মূল্যবান দুটি কর্নিয়া সংগ্রহ করে মেডিকেল কলেজের আরআইও-তে জমা দেওয়া হয়। যেখানে কর্নিয়াজনিত দৃষ্টিহীন দুজন মানুষের চোখে যা প্রতিস্থাপিত হবে। দুজন ফিরে পাবেন তাঁদের দৃষ্টি।

প্রতিবেদক **সীতাংশু ভাদুড়ী**